কিশোর ক্লাসিক

কপালকুণ্ডলা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ
সেবা প্রকাশনী, ১৯৮৫
প্রজাপতি সংস্করণ
১৯৯৬
প্রচ্ছদ
আসাদুজ্জামান
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩৪১৮৪
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

KAPALKUNDALA
By: Bankimchandra Chatterjee
Retold By: Neaz Morshed
ISBN 984-462- 261- 1
মূল্য ॥ ছত্রিশ টাকা

কিশোর ক্লাসিক

কপালকুণ্ডলা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রূপান্তর

নিয়াজ মোরশেদ

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রজাপতি প্রকাশনের আরও ক'টি অনুবাদ

ফ্রেড জিপসন
শিকারি পুরুষ
ওল্ড ইয়েলার
মার্ক টোয়েন
দুঃসাহসী টম সয়্যার
গোয়েন্দা টম সয়্যার
নভোচারী টম সয়্যার
হাকলবেরি ফিন
ফার্লে মোয়াট
তিমির প্রেম
রবার্ট লুই স্টিভেনসন
ট্রেজার আইল্যাণ্ড
ড. জেকিল অ্যাণ্ড মি. হাইড
কালোতীর
রবার্ট লুই স্টিভেনসন ও জর্জ ইলিয়ট
বোতল শয়তান ও সাইলাস মারনার
রবার্ট মাইকেল ব্যালান্টাইন
প্রবাল দ্বীপ
গরিলা শিকারী
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড সী
হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড
সলোমনের গুপ্তধন
ড্যানিয়েল ডিফো
রবিনসন ক্রুসো
জ্যাক লণ্ডন
সী উলফ
দ্য কল অভ দ্য ওয়াইল্ড
জেরোম কে জেরোম
ত্রিরত্নের নৌ-বিহার
ব্যারোনেস ওর্কজি
দ্য স্কারলেট পিম্পারনেল
জোনাথন সুইফট
গালিভার্স ট্র্যাভেলস
জেমস হিলটন
লস্ট হরাইজন
পার্ল এস. বাক
দ্য গুড আর্থ
আলেকজাণ্ডার ডুমা
তিন মাস্কেটিয়ার
রাফায়েল সাবাতিনি
ক্যাপ্টেন ব্লাড
অ্যানটনি হোপ
জেণ্ডার বন্দী
জেমস্ ফেনিমোর কুপার
দ্য লাস্ট অভ দ্য মোহিকান্স
দি প্রেইরি
চার্লস ডিকেন্স
আ ক্রিসমাস ক্যারল
নিকোলাস নিকলবি
আর. ডি. ব্ল্যাকমোর
লর্না ডুন
জোসেফ কনরাড
লর্ড জিম
এরিখ কেস্টনার
এমিলের গোয়েন্দা দল
পিটার ট্রিমেন
রক্তবীজ
এইচ.জি.ওয়েলস
টাইম মেশিন
এরিক মারিয়া রেমার্ক
অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট
সাইলাস হকিং
হার বেনি
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল
হারানো পৃথিবী
জুল ভার্ন
বেগমের রত্নভাণ্ডার
বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ
রহস্যের দ্বীপ
নোঙর ছেঁড়া
মাইকেল স্ট্রগফ
সাগর তলে
কারপেথিয়ান দুর্গ
গুপ্ত রহস্য
ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস
চাঁদে অভিযান

প্রথম খণ্ড

এক

সাগর সঙ্গমে

প্রায় আড়াইশো বছর আগের কথা।

মাঘ মাসের এক শেষরাতে একটি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর থেকে ফিরছে। পর্তুগীজ ও অন্যান্য জলদস্যুদের ভয়ে সে সময় যাত্রীর নৌকা সাধারণত দল বেঁধে যাতায়াত করতো। কিন্তু এই নৌকাটি নিঃসঙ্গ। শেষ রাতের ঘন কুয়াশায় নাবিকরা দিক ঠিক করতে না পেরে বহর ছেড়ে দূরে চলে এসেছে। এখন কোন্ দিকে কোথায় যাচ্ছে কেউ বলতে পারে না।

আরোহীদের বেশির ভাগই ঘুমিয়ে। এক বৃদ্ধ আর এক যুবক, এই দুজনই শুধু জেগে আছেন। আলাপ করছেন তাঁরা। হঠাৎ কথাবার্তা থামিয়ে বৃদ্ধ এক নাবিককে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও মাঝি, আজ কতদূর যেতে পারবে?'

মাঝি একটু ইতস্তত করে জবাব দিলো, 'বলতে পারলাম না।'

রেগে গেলেন বৃদ্ধ। বকাঝকা করতে লাগলেন মাঝিকে।

যুবক থামালো তাকে। 'মহাশয়, যা জগদীশ্বরের হাতে তা পণ্ডিতরাও বলতে পারে না—ও মূর্খ কি করে বলবে? আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

'ব্যস্ত হবো না?' উগ্রকণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ, 'বলো কি, ব্যাটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান কেটে নিয়ে গেল, আর তুমি বলছো ব্যস্ত হবো না! ছেলেপিলেরা সারা বছর খাবে কি?'

বাড়ি থেকে রওনা হয়ে আসার পর অন্য নৌকায় আসা এক যাত্রীর কাছে খবরটা পেয়েছিলেন বৃদ্ধ।

'আমি তো আগেই বলেছিলাম,' বললো যুবক। 'আপনার বাড়িতে যখন বড় আর কেউ নেই—আপনার আসা উচিত হয়নি।'

বৃদ্ধ আগের মতোই উগ্রভাবে বললেন, 'আসবো না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, এখন যদি পরকালের কাজ না করি তো কবে করবো?'

'দেখুন, শাস্ত্রের যতটুকু আমি জানি, পরকালের কাজ তীর্থদর্শনে যেমন হয়, বাড়িতে বসেও তেমন হতে পারে।'

'তা হলে তুমি এলে কেন?'

'আমি তো তীর্থ করতে আসিনি। সমুদ্র দেখার বড় সাধ ছিলো, তাই এসেছি।' একটু থামলো যুবক। মৃদু স্বরে বললো, 'আহ! কি দেখলাম, জন্ম জন্মান্তরেও ভুলবো না…!'

বৃদ্ধ এখন আর যুবকের কথা শুনছেন না। একটু দূরে মাঝিরা নিজেদের মধ্যে যে আলাপ করছে সেখানে চলে গেছে তাঁর কান।

এক মাঝি অন্য জনকে বলছে, 'ও ভাই, এ তো বড় খারাপ কাজ হলো। বার

দরিয়ায় এসে পড়লাম না কোন্ দেশে এলাম কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

স্পষ্ট ভীতি বক্তার গলায়। বৃদ্ধ বুঝলেন, ভয়ানক কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে, মাঝি?'

মাঝি কোনো জবাব দিলো না।

মাঝিদের কথা যুবক শুনেছে। বৃদ্ধের প্রশ্নও। জবাবের অপেক্ষা না করে বাইরে এলো সে। ভোর হতে আর বাকি নেই বিশেষ। চারদিক গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা। বেশি দূর চোখ যায় না। আকাশ, নক্ষত্র, চাঁদ, উপকূল, কোনো দিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই দিক ভুল হয়েছে নাবিকদের। কোন্ দিকে যাচ্ছে না যাচ্ছে কিছু ঠিক করতে পারছে না, পাছে বার সমুদ্রে পড়ে অকূলে মারা যায়, এই ভেবে ভয় পেয়েছে।

ঠাণ্ডা ঠেকানোর জন্যে ছইয়ের সামনে পর্দা দেওয়া। তাই ভেতরের আরোহীরা কেউ এ বিয়য়ে কিছু জানতে পারেনি। যুবক সব বুঝে ভেতরে এসে বৃদ্ধকে বললো সব কথা। সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ পড়ে গেল নৌকার মধ্যে। কয়েকজন মহিলা আছে নৌকায়। কথার শব্দে জেগে গেছে তারা। নৌকা দিক হারিয়েছে, একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ উঠলো তাদের মধ্যে।

বৃদ্ধ হাউমাউ করে উঠলেন, 'কিনারায় পড়! কিনারায় পড়! কিনারায় পড়।'

যুবক একটু হেসে বললো, 'কিনারা কোথায় তা জানতে পারলে তো আর সমস্যাই ছিলো না।'

শুনে আরোহীদের কোলাহল আরো বেড়ে গেল। যুবক কোনো মতে তাদের শান্ত করে বাইরে এলো।

'ভয়ের কিছু নেই,' মাঝিদের উদ্দেশ্যে বললো সে। 'ভোর হয়ে গেছে। চার পাঁচ দণ্ডের ভেতর সূর্য উঠবে। এই সময়ের ভেতর নিশ্চয়ই ডুবে যাবে না নৌকা। তোমরা বাওয়া বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যেখানে খুশি যাক। পরে রোদ উঠলে পরামর্শ করা যাবে।'

যুবকের কথা মেনে নিয়ে সেই মতো কাজ করলো মাঝিরা।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল এখনো সূর্যের দেখা নেই। মাঝিরা বসে আছে চুপচাপ। ঘন কুয়াশায় এখনো ছেয়ে আছে চারদিক। ভয়ে কাঁপছে যাত্রীরা। বেশি বাতাস নেই, তার ওপর আতঙ্ক, নৌকার মৃদু দুলুনি টের পেলো না কেউ। সবাই ধরে নিয়েছে মৃত্যু নিশ্চিত, আর, খুব একটা দেরিও নেই তার। পুরুষরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপছে, মহিলারা সুর তুলে নানা রকম বিলাপ করতে করতে নাকি সুরে কাঁদছে। এক মহিলা গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দিয়ে এসেছে, ছেলেকে জলে নামিয়ে আর তুলতে পারেনি—সে-ই কেবল কাঁদছে না।

অপেক্ষা করতে করতে মনে হলো বেলা প্রায় এক প্রহর হয়ে গেছে। এমন সময় হঠাৎ মাঝিরা দরিয়ার পাঁচপীরের নাম জপে মহা হৈ-চৈ করে উঠলো।

'কি! কি! মাঝি, কি হয়েছে?' যাত্রীরা সবাই এক সাথে জিজ্ঞেস করে উঠলো।

'রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে! ঐ দেখ ডাঙা!' মাঝিরাও এক সাথে হৈ-চৈ করে জবাব দিলো।

যাত্রীরা সবাই মহা উৎসাহে নৌকার বাইরে এসে দাঁড়ালো। সবার চোখে প্রশ্ন, কোথায় এসেছে? ডাঙা কতদূর? বিপদ কেটেছে তো?

পরম স্বস্তির সাথে সবাই দেখলো, সূর্য উঠেছে। একেবারে কেটে গেছে কুয়াশা। বেলা এক প্রহর পেরিয়ে গেছে। যে জায়গায় নৌকা এসে পড়েছে সেটা ঠিক সমুদ্র নয়, বড় এক নদীর মোহনা। সেখানে নদী যে রকম চওড়া তেমন আর কোথাও নয়। নদীর এক তীর নৌকার খুব কাছে—বলা যেতে পারে মাত্র পঞ্চাশ হাতের মধ্যে, কিন্তু অন্য তীরের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। একমাত্র এই তীরের দিকটি ছাড়া আর যে দিকেই তাকানো যায়, অথৈ পানি ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। বিস্তীর্ণ জলরাশি দূর দিগন্তে আকাশের সাথে মিশে গেছে। তীরের কাছে পানির রঙ একটু ঘোলাটে, নদীর পানির মতো। কিন্তু দূরের জলরাশি নীলাভ একটা রঙ ধারণ করেছে।

আরোহীরা ভাবলো, মহাসমুদ্রে এসে পড়েছে তারা। তবে সৌভাগ্য, উপকূল কাছে, ভয়ের কিছু নেই। সূর্য দেখে দিক ঠিক করলো অনেকে। সামনের পাড়টা যে সাগরের পশ্চিম তীর তাতে সন্দেহ রইলো না কারো। নৌকা ছাড়িয়ে কিছু দূরে, তীরের ভেতর দিকে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা নদীমুখ। ছোট্ট নদীটার এখনকার নাম রসুলপুরের নদী।

দুই নদী যেখানে মিলেছে তার ডান দিকে অসংখ্য চেনা অচেনা পাখির ঝাঁক। তাদের কেউ আপন মনে বসে আছে, কেউ উড়ছে, কেউ খাবার খুঁজছে।

দুই

উপকূলে

আরোহীদের দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। মহিলাদের কান্নাও কোথায় পালিয়েছে তার খোঁজ নেই। মাঝিরা জানালো, জোয়ারের দেরি আছে, এই ফাঁকে যাত্রীরা সামনের সৈকতে রান্না-খাওয়া সেরে নিতে পারেন, পরে জোয়ার এলে বাড়ির পথে রওনা হওয়া যাবে।

যাত্রীরা সানন্দে রাজি হলো এ প্রস্তাবে। নৌকা তীরে নিয়ে ভিড়ালো মাঝিরা। এক এক করে যাত্রীরা নেমে গেল নিচে। অনেকক্ষণ পর শক্ত মাটির ওপর হাঁটতে পেরে খুশি সবাই। হাত-মুখ ধুয়ে স্নান সেরে নিলো অনেকে। রান্নার জোগাড় করতে লাগলো দু'এক জন।

সব কিছু ঠিকঠাক মতো চলছে। চাল-ডাল ধোয়া হয়ে গেছে। চুলা বানানো শেষ। নৌকা থেকে কাঠ এনে আগুন ধরালেই হয়। এমন সময় জানা গেল, রান্নার মতো কাঠ নেই নৌকায়। যা ছিলো আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন ডাঙার আরো ভেতরে গিয়ে কাঠ জোগাড় করে না আনলে রান্না হবে না। কিন্তু কে যাবে কাঠ আনতে? বাঘের ভয়ে কেউ রাজি হলো না যেতে। শেষে সবাইকে উপোষ থাকতে হয় দেখে সেই বৃদ্ধ সেই যুবককে ডেকে বললেন, 'বাপু, নবকুমার, তুমি একটা কিছু

উপায় করো দেখি। না হলে আমাদের এতগুলো লোককে উপোষ দিতে হবে।'

একটু ভাবলো নবকুমার। 'ঠিক আছে যাব, বলে মাঝিদের দিকে ফিরলো সে. 'একটা কুড়াল দাও দেখি। আর দা নিয়ে কেউ একজন এসো আমার সাথে।'

কেউ নবকুমারের সাথে যেতে রাজি হলো না।

'খাবার সময় বোঝা যাবে!' তীব্র ক্ষোভে আর কিছু বলতে পারলো না নবকুমার। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকালো ভীরু লোকগুলোর দিকে। তারপর কোমর বেঁধে একাই কুঠার হাতে চললো কাঠ সংগ্রহ করতে।

সৈকত থেকে পাড়ে উঠলো নবকুমার। সামনে যতদূর চোখ যায় জনমানব বা লোকবসতির চিহ্ন নেই। কেবল বন আর বন। একটা ব্যাপার খেয়াল করলো নবকুমার, বনের গাছপালা খুব একটা বড় বা ঘন নয়। ছোট ছোট গাছ। মাঝে মাঝে কিছু জায়গা নিয়ে ঝোপ মতো তৈরি করেছে। জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করার মত কাঠ এই সব ছোট গাছ থেকে পাওয়া যাবে না। উপযুক্ত গাছের খোঁজে হাঁটতে শুরু করলো সে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক্ক দূর এসে পড়েছে নবকুমার। অবশেষে একটা গাছ দেখতে পেলো যা থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা যায়। লেগে গেল ও কাঠ কাটতে। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় সংগ্রহ করতে পারলো প্রয়োজনীয় কাঠ। এবার ফিরতে হবে। কিন্তু গোল বাধালো কাঠের বোঝা।

অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে নবকুমার। কায়িক পরিশ্রমের খুব একটা অভ্যাস নেই। কিছুটা বৃদ্ধের কথায়, কিছুটা পৌরুষ দেখানোর জন্যে একাই কাঠ জোগাড় করতে এসেছিলো। এখন বোঝা বইতে গিয়ে টের পাচ্ছে কাজটা ভালো করেনি। যাহোক, ভালো হোক, খারাপ হোক একবার যে কাজে হাত দিয়েছে তার শেষ না দেখে ছাড়তে রাজি নয় নবকুমার। প্রচণ্ড পরিশ্রম হলেও কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে হাঁটতে লাগলো ও। কিছু দুর হাঁটে, কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেয়, আবার হাঁটে; এভাবে এগোতে লাগলো।

প্রায় আধ প্রহর হয়ে গেছে কাঠ আনতে গেছে নবকুমার, এখনো খোঁজ নেই তার। চিন্তায় পড়ে গেছে সহযাত্রীরা। এত দেরি হওয়ার তো কোনো কারণ নেই! অনেকে এমনও ভাবছে, নির্ঘাৎ বাঘের কবলে পড়েছে সে। ফিরে আসার সম্ভাব্য সময় পেরিয়ে যাবার পর সবাই মোটামুটি বিশ্বাস করে নিলো কথাটা। অথচ কারো সাহস বা ইচ্ছা হলো না, উঠে কিছুদূর গিয়ে তার খোঁজ করে।

আরোহীরা যখন এ রকম জল্পনা কল্পনা করছে তখন ভৈরব কল্লোল উঠলো সাগরে। নাবিকরা বুঝলো, জোয়ার আসছে। এরকম জায়গায় জোয়ার আসার সময় প্রচণ্ড বেগে ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ে। পাড়ের কাছাকাছি নৌকা বা এ জাতীয় কিছু থাকলে ঢেউয়ের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। মাঝিরাও তা জানে। তাই এক মুহূর্ত দেরি না করে নৌকার বাঁধন খুলে দিলো তারা। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল যাত্রীদের ভেতর—কে কার আগে নৌকায় উঠবে। সব কজন লোক কোনো মতে নৌকায় ওঠার অবসর পেলো শুধু। পর মুহূর্তে জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়ে

গেল সৈকত। হাড়িকুড়ি, চাল-ডাল যা ছিলো সেখানে সব ভেসে গেল।

তীর থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছে নৌকা। এমন সময় দেখা দিলো আর এক বিপত্তি। নৌ চালনায় খুব একটা দক্ষ নয় মাঝিরা, জোয়ারের তোড়ের মুখে নৌকা সামলাতে পারলো না তারা। রসুলপুরের নদীর দিকে ভেসে যেতে লাগলো নৌকা।

'নবকুমার রইলো যে?' বললো এক যাত্রী।

'আহ, তোমার নবকুমার কি আর আছে?' জবাব দিলো এক মাঝি। 'তাকে শেয়ালে খেয়েছে।'

জোয়ারের তোড় ছোট নদীটার দিকে নিয়ে যাচ্ছে নৌকাটাকে। এখনই যদি ঠেকানো না যায়, ফিরতে ভীষণ কষ্ট হবে। সে জন্যে নাবিকরা প্রাণপণে চেষ্টা করছে নদীর বাইরে থাকার। এই মাঘ মাসের দিনেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে তাদের কপালে।

দীর্ঘ পরিশ্রমের পর রসুলপুরের নদীর মুখ থেকে নৌকা সরিয়ে আনতে পারলো মাঝিরা। এবার দেখা দিলো আরেক বিপদ। যেই নদী মুখের বাইরে এলো, অমনি সেখানকার আরো প্রবল স্রোতে উত্তরমুখী হয়ে তীর বেগে ছুটতে লাগলো নৌকা। সে-গতি বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না মাঝিরা। তাদের শত চেষ্টাতেও নৌকা আর ফিরলো না।

নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে—স্রোতের বেগ যখন এতটা কমে এলো তখন যাত্রীরা সেই ছোট নদীর মুখ পেরিয়ে অনেক দূর এসে পড়েছে। নবকুমারের জন্যে ফিরে যাওয়া হবে কিনা এই নিয়ে বিতণ্ডা শুরু হলো এবার। কেউ কেউ বললো ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু বেশির ভাগই মত দিলো বিপক্ষে। যাত্রীদের মধ্যে নবকুমারের আত্মীয় বা বন্ধু কেউ নেই। যে দু'একজন পরিচিত লোক আছে তারা নিছক প্রতিবেশী। তারা ভেবে দেখলো, নৌকা যেখানে এসে পড়েছে সেখান থেকে ফিরে যেতে হলে আবার ভাটা লাগার অপেক্ষা করতে হবে। তারপরে রাত হয়ে যাবে। রাতে নৌকা চালাতে পারবে না মাঝিরা, পারলেও গত রাতের অভিজ্ঞতার পর আর ঝুঁকি নিতে চায় না তারা। সুতরাং পরদিন আবার জোয়ার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তার অর্থ দুই দিন অনাহারে থাকা—তাতে রাজি হলো না কেউ। নাবিকরাও ফিরে যাওয়ার ঘোর বিরোধী। তাদের বক্তব্য, বাঘে খেয়েছে নবকুমারকে। এ ছাড়া তার ফিরতে এত দেরি হওয়ার আর কোনো কারণ থাকতে পারে না। তা হলে খামোকা অত কষ্ট আর সময় নষ্ট করা কেন?'

ঠিক হলো, নবকুমারকে ছাড়াই দেশে ফিরবে যাত্রীরা।

তিন

বিজনে

মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে নদীতীরে ফিরতেই ধক্ করে উঠলো নবকুমারের বুকের

ভেতর। নৌকা নেই! ভয়ে হাত পা হিম হয়ে আসতে চাইলো ওর। ওকে রেখেই চলে গেছে অন্যরা? পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো নবকুমার নির্জন সৈকতে।

ধীরে ধীরে সাহস ফিরে এলো ওর । ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলো পরিস্থিতি। সঙ্গীরা যে ওকে একেবারে ছেড়ে চলে গেছে তা মনে হলো না। জোয়ারে সৈকত ডুবে যাওয়ায় নৌকা বাঁচানোর জন্যে আশপাশে কোথাও গিয়ে নৌকা ভিড়িয়েছে হয়তো, কিছুক্ষণের ভেতর ফিরে আসবে আবার। এই ভেবে অপেক্ষা করতে লাগলো ও। কিন্তু নৌকা এলো না। আরোহীদেরও কেউ এলো না।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল এভাবে। খিদেয় প্রাণ বেরিয়ে যাবার দশা নবকুমারের। আর বসে থাকা যায় না। নৌকার খোঁজে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করলো ও। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পরও যখন নৌকার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না তখন ফিরে এলো আগের জায়গায়। আসতে আসতে ভাবছিলো, হয়তো ফিরে গিয়ে দেখবে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে নৌকা। কিন্তু হায়, শূন্য সৈকত পড়ে আছে নির্জন।

হতাশ হলো না নবকুমার। ভাবলো, জোয়ারের স্রোতে বোধহয় অনেকদূর ভেসে গেছে নৌকা, এখন প্রতিকূল স্রোতে ফিরে আসতে দেরি হচ্ছে। পরিস্থিতি অনুকূল হলেই এসে পড়বে ওরা।

জোয়ার শেষ হলো। ফিরলো না নৌকা। এখন নবকুমার ভাবছে, জোয়ারের স্রোত বোধহয় প্রবল ছিলো তাই ফিরতে পারেনি সঙ্গীরা; এখন ভাটায় নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। কিন্তু ভাটা লাগার পরেও অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বেলা পড়ে এলো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। সূর্য ডুবে গেল এক সময়। আসার হলে এতক্ষণে ফিরে আসতো নৌকা।

কঠিন সত্যটার মুখোমুখী হলো এবার নবকুমার—হয় জোয়ারের সময় ডুবে গেছে নৌকা, নয়তো এই বিজন জায়গায় ওকে চিরদিনের জন্যে ছেড়ে চলে গেছে সঙ্গীরা। নিজে নিজে ঠোঁট কামড়ানো ছাড়া আর কিছু করার নেই ওর। আশপাশে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। খাবার নেই, পানি নেই; নদীর জল নোনা—খাওয়ার কথা ভাবাও যায় না। এদিকে খিদে-পিপাসায় অস্থির হয়ে উঠেছে ও। এমন কোনো কাপড় নেই সাথে যা এই প্রচণ্ড শীতের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে পারে। শীতবস্ত্র যা ছিলো সব নৌকায় রয়ে গেছে। রাতে বাঘ ভালুকের উৎপাতের সম্ভাবনা। অর্থাৎ বাঁচার কোনো আশা নেই বললেই চলে।

কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নয় নবকুমার। মরলেও শেষ পর্যন্ত বাঁচার চেষ্টা করে তবে মরবে। সৈকত ছেড়ে পাড়ের ওপর উঠলো ও। মোটামুটি একটা আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো এদিক ওদিক।

এক সময় পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে এলো চারপাশ। একটা একটা করে তারা ফুটে উঠতে লাগলো আকাশে। একটানা সমুদ্রের গর্জন ছাড়া নিথর নীরব চারদিক। মাঝে মাঝে দু'একটা বন্য পশুর ডাক শোনা যাচ্ছে। এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে নবকুমার। কি করবে কিছু বুঝতে পারছে না ও। চলতে চলতে যেকোনো মুহূর্তে হিংস্র পশুর মুখোমুখী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এক জায়গায় বসে থাকলেও সেই

আশঙ্কা।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লো নবকুমার। সারাদিন কিছু খায়নি, সে কারণে আরো বেশি অবসন্ন লাগছে। নদীতীরে বিশাল এক বালিয়াড়ির পাশে হেলান দিয়ে বসলো ও। কিছুক্ষণের ভেতর তলিয়ে গেল ঘুমের অতলে।

চার

স্তূপশিখরে

যখন নবকুমারের ঘুম ভাঙলো, তখন রাত গভীর। এখনো বাঘের পেটে যায়নি দেখে ভীষণ আশ্চর্য হলো ও। ভয়ে ভয়ে একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখলো, বাঘ আসছে কি না। কিন্তু না, বাঘ নয়, অনেক দূরে অস্পষ্ট একটা আলোর রেখা চোখে পড়লো। ভুল দেখলো নাকি? দুহাতে চোখ ডলে আবার তাকালো ভালো করে। না ভুল দেখেনি ও। আলোর আকার আর উজ্জ্বলতা ক্রমশ বাড়ছে। কেউ অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়েছে বোধহয়।

নতুন আশার সঞ্চার হলো নবকুমারের মনে। এখন দাবানলের সময় নয়। তাহলে মানুষ না থাকলে এই আলো এলো কোত্থেকে?

হাঁটতে শুরু করলো ও আলো লক্ষ্য করে। একবার ভাবলো, ভৌতিক আলো নয় তো? হতেও পারে। কিন্তু ভয় পেয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে কবে কোথায় মানুষ বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে?

দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল নবকুমার। গাছ, লতা, বালিয়াড়ি পদে পদে তার গতিরোধ করছে। কিন্তু সব বাধা পায়ে দলে পৌঁছে গেল ও আলোর উৎসের কাছে।

নবকুমার দেখলো, অনেক উঁচু একটা বালিয়াড়ির চূড়ায় আগুন জ্বলছে। তার সামনে বসে আছে ভীষণ চেহারার এক লোক। আগুনের আভায় আকাশের গায়ে আঁকা আগুন বরণ ছবির মতো দেখাচ্ছে তাকে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো নবকুমার, লোকটার কাছে যাবে। দুরু দুরু বুকে উঠতে শুরু করলো বালির স্তূপ বেয়ে। চূড়ায় পৌঁছে লোকটার সামনে গিয়ে যা দেখলো তাতে গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল ওর।

চোখ বুজে ধ্যান করছে লোকটা—দেখতে পায়নি নবকুমারকে। পায়ের শব্দ শুনে ওর উপস্থিতি টের পেয়েছে কিনা বোঝার উপায় নেই। লোকটার বয়েস প্রায় পঞ্চাশ। গায়ে কোনো কাপড় আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত বাঘের চামড়ায় আবৃত। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। আয়তাকার মুখটায় ঘন কালো দাড়ি। মাথায় জটা। সামনে কাঠ জ্বেলে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হয়েছে। উৎকট দুর্গন্ধে ভারি হয়ে আছে জায়গাটার বাতাস। দুর্গন্ধের কারণ কি এতক্ষণ বুঝতে পরেনি নবকুমার। লোকটার আসনের দিকে তাকাতে স্পষ্ট হয়ে গেল। শির শির করে ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে এলো ওর শিরদাঁড়া বেয়ে।

গলাকাটা একটা গলিত শবের ওপর বসে আছে জটাধারী। সামনে একটা

মাথার খুলি। লাল রঙের তরল পদার্থ তাতে।

চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হাড়গোড়। এমনকি জটাধারীর গলার রুদ্রাক্ষের মালায়ও ছোট ছোট হাড়ের টুকরো। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলো নবকুমার। আর একটু এগোবে না চলে যাবে, ঠিক করতে পারলো না। কাপালিকদের কথা শোনা ছিলো ওর। এ লোক কাপালিক না হয়েই যায় না।

এখনো ধ্যানী ভঙ্গিতে চোখ বুজে বসে আছে কাপালিক। নবকুমারকে দেখেছে কিনা, বা ওর উপস্থিতি টের পেয়েছে কিনা বোঝার উপায় নেই চেহারা দেখে। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে নবকুমার। নড়াচড়ার শক্তিও যেন লোপ পেয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পর—কতক্ষণ জানে না নবকুমার, চোখ না খুলেই কাপালিক সংস্কৃতে জিজ্ঞেস করলো, 'কে তুমি?'

'ব্রাহ্মণ' জবাব দিলো নবকুমার।

'অপেক্ষা কর।'

আবার ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেল কাপালিক। দাঁড়িয়ে রইলো নবকুমার।

প্রায় আধ প্রহর কেটে গেল এভাবে। অবশেষে চোখ খুললো কাপালিক। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে তাকালো নবকুমারের দিকে। আগের মতো সংস্কৃতে বললো, 'এসো আমার সাথে।'

একথা ঠিক, অন্য সময় হলে কক্ষণো এর সঙ্গী হতো না নবকুমার। কিন্তু এখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। একটা আশ্রয়েরও বড়ো প্রয়োজন।

'প্রভুর যা আজ্ঞা,' বললো ও। 'কিন্তু আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় কাতর। কোথায় গেলে খাওয়ার মতো কিছু পাবো, বলবেন?'

'আমার সাথে এসো, সব পাবে।'

কাপালিকের পেছন পেছন চলতে লাগলো নবকুমার। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটলো তারা—কেউ কারো সাথে কথা বললো না। অবশেষে একটা পর্ণকুটিরের সামনে এসে দাঁড়ালো দুজন। কাপালিক আগে ঢুকলো। নবকুমারকে ডাকলো ভেতরে। একটু ইতস্তত করে কুটিরে ঢুকলো নবকুমার। এক টুকরো কাঠে আগুন জ্বাললো কাপালিক। কি দিয়ে, কি করে আগুন জ্বালানো হলো কিছুই বুঝতে পারলো না নবকুমার। আগুনের মৃদু আলোয় দেখলো, পুরো কুটিরটা কিয়াপাতায় তৈরি। মাঝখানে কয়েকটা বাঘের চামড়া। এক পাশে এক কলস পানি আর কিছু ফলমূল। এছাড়া আর কিছু নেই কুটিরে।

'ফলমূল যা আছে আত্মসাৎ করতে পারো,' বললো কাপালিক। 'কলসে পানি আছে, পান কোরো। বাঘের চামড়া আছে, ইচ্ছে হলে ঘুমিও। নির্বিঘ্নে থাকতে পারো এখানে, বাঘের ভয় কোরো না। পরে আবার আমার সাথে সাক্ষাৎ হবে। যে পর্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্যন্ত এ কুটির ছেড়ে কোথাও যেও না।'

চলে গেল কাপালিক।

ফলগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো নবকুমার। গোগ্রাসে খেয়ে নিলো সবটুকু। কলসের পানি একটু তিতকুটে স্বাদের হলেও ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললো

অনেকখানি। এবার একটু স্বস্তি বোধ করছে। একটু পরেই বাঘের চামড়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো ও।

পাঁচ

সমুদ্রতটে

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম যে কথাটা মনে হলো নবকুমারের তা হলো বাড়ি ফিরতে হবে। আর কিছু না হোক, এই কাপালিকের সান্নিধ্য থেকে দূরে যাওয়ার জন্যে হলেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়তে হবে এখান থেকে। কিন্তু ভাবা যত সোজা, করা তত সোজা নয়। এই পথহীন বনের ভেতর থেকে কি করে বের হবে ও? কি করেই বা পথ চিনে বাড়ি যাবে? কাপালিক নিশ্চয়ই পথ জানে, জিজ্ঞেস করলে কি বলে দেবে না? বিশেষ করে, এখন পর্যন্ত ওর সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি কাপালিক—তা হলে কেন ভয় পাচ্ছে ও? এদিকে কাপালিক আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত কুটির ছেড়ে বেরোতে বারণ করে গেছে। লোকটার অবাধ্য হওয়া কি ঠিক হবে? শুনেছে, কাপালিকরা নাকি মন্ত্র বলে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে—সুতরাং তার সাথে আবার দেখা হওয়ার আগে কুটির ছেড়ে বেরোনো অনুচিত। এই সব নানা কথা ভেবে আপাতত কুটিরে থাকবে বলেই ঠিক করলো নবকুমার।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো। এক সময় সূর্য ঢলে পড়লো পশ্চিমাকাশে। বিকেল হলো। এখনও দেখা নেই কাপালিকের। আগের দিন প্রায় উপবাসে কেটেছে নবকুমারের। আজ এ পর্যন্ত খাওয়া জোটেনি। খিদেয় প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড়। কুটিরে যে সামান্য ফলমূল ছিলো তা কাল রাতেই শেষ হয়ে গেছে। এখন বাইরে বেরিয়ে ফলমূল বা অন্য কোনো খাবার যোগাড় না করলেই নয়। কুটির ছেড়ে বের হলো নবকুমার। তখন সন্ধ্যা হতে সামান্য বাকি।

কুটিরের আশেপাশেই বালির ঢিবি চোখে পড়লো ওর। বালিতে জন্মে এমন দু'একটা গাছ দেখা গেল সেগুলোর ওপর। কিছু গাছে ফল ধরে আছে। তাড়াতাড়ি একটা গাছের ফলের স্বাদ নিয়ে দেখলো, বাদামের মতো চমৎকার খেতে। আর পায় কে নবকুমারকে? ঐ ফল খেয়ে পেট ভরালো সে।

বালির ঢিবিগুলো চওড়ায় খুব বেশি নয়। সামান্য একটু হেঁটেই পেরিয়ে গেল ও জায়গাটা। তার পরেই ঘন বন। সেই বনের ভেতর ঢুকে এগিয়ে চললো নবকুমার।

অচেনা জঙ্গলে খুব সহজেই পথ ভুল হতে পারে। নবকুমারেরও তাই হলো। কিছুদূর আসার পর, আশ্রম কোন্ দিকে আর ঠিক করতে পারলো না। মনে মনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো ও। এলোমেলো হেঁটে বেড়ালো আরো কিছুক্ষণ। হঠাৎ গম্ভীর সাগর গর্জন কানে এলো। বুঝতে পারলো নবকুমার, কাছেই সমুদ্র। শব্দ লক্ষ্য করে এগোলো ও। কিছুদূর হাঁটার পর একটা ঝোপের বাইরে এসেই দেখলো, সামনে সাগর।

দিগন্ত বিস্তৃত নীল সমুদ্র দেখে হঠাৎ করেই খুশি হয়ে উঠলো নবকুমারের মন। পাড় থেকে নেমে এলো সৈকতে। নিশ্চিন্ত মনে বসে পড়লো বালির ওপর। ফেনিল নীল অনন্ত সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় পানি আর পানি। ছোট ছোট ঢেউ আপন মনে মাথা তুলছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে জলের তলে। সূর্য ডুবতে বেশি বাকি নেই। কমলা হয়ে এসেছে পশ্চিমের আকাশ। সেই আভায় সোনার রঙ ধরেছে সমুদ্র। চারদিকে বিশাল-গম্ভীর নীরবতা। অনেক দূরে একটা ইউরোপীয় জাহাজ বিরাট একটা সামুদ্রিক পাখির মতো পাল তুলে চলে যাচ্ছে। এমন বিশালতার সামনে আপনিই মাথা নুয়ে আসতে চায়।

বসে বসে দেখছে নবকুমার। কতক্ষণ ধরে যে তা ও নিজেও বলতে পারেবে না। এক সময় সূর্য ডুবে গেল। সাগরের সোনালী পশ্চিম দিকটা কালো রং ধারণ করলো। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে এলো চারদিক। এবার নবকুমারের চেতনা হলো, কাপালিকের কুটির খুঁজে বের করতে হবে। লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো ও। এমন জায়গা ছেড়ে যেতে কার মন চায়? এদিকে হিংস্র প্রাণীর ভয়, না যেয়েই বা উপায় কি?

ঘুরে দাঁড়ালো নবকুমার। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মতো জমে গেল ও। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় সৈকতে দাঁড়িয়ে আছে এক অপূর্ব রমণীমূর্তি। মাথার এলো চুলগুলো নেমে এসেছে কাঁধ ছাড়িয়ে, কোমর ছাড়িয়ে আরো নিচে। ঘন চুলের জন্যে মুখটা ভালো মতো দেখা যাচ্ছে না। তবু যেটুকু দেখতে পেলো নবকুমার তা-ই যেন ছেঁড়া-খোড়া মেঘের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসা চাঁদের আলো। বিশাল চোখ জোড়ায় স্থির-স্নিগ্ধ দৃষ্টি। স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর, স্থির অথচ জ্যোতির্ময়। সূর্য কিরণের তেজ তাতে নেই। যা আছে তার সাথে চাঁদের কোমল আলোরই কেবল তুলনা চলে। কাঁধ ছাড়িয়ে নেমে আসা ঘন কুন্তলে বাহুযুগলও ঢাকা পড়ে গেছে। রমণীদেহ একেবারে অলংকারবিহীন। সব মিলিয়ে এমন একটি মোহিনীমূর্তি যা বলে বোঝানো যায় না।

নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে নবকুমার। কথা বলার শক্তিও যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। রমণীও স্পন্দনহীন। বিশাল চোখ দুটো মেলে পলকহীন তাকিয়ে আছে নবকুমারের দিকে। দুজনের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু, নবকুমারের দৃষ্টি চমকে ওঠা মানুষের মতো; রমণীর দৃষ্টিতে তেমন কিছু নেই, বরং একটু উদ্বেগের ছায়া যেন তাতে। দুজনেই তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। দুজনেই যেন ভাবনায় পড়ে গেছে, কে আগে নীরবতা ভাঙবে।

অনেকক্ষণ পর তরুণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো সে, 'পথিক, তুমি পথ হারিয়েছ?'

নবকুমারের হৃদয়বীণা বেজে উঠলো এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে। বিচিত্র হৃদয় যন্ত্রের তন্ত্রীগুলো মাঝে মাঝে এমন লয়হীন হয়ে থাকে যে, যতই চেষ্টা করা যাক, কিছুতে একে অপরের সাথে মিলতে চায় না। কিন্তু একটি শব্দে, রমণীকণ্ঠের মাত্র একটি শব্দে তা শুধরে যায়, সবই আবার লয়ে চলে আসে। সেই মুহূর্ত থেকে সঙ্গীতের মতো হয়ে ওঠে জীবন যাপন। তরুণীর কণ্ঠস্বর নবকুমারের কানেও তেমন করে

বাজলো।

'পথিক তুমি পথ হারিয়েছ?' এ-স্বর নবকুমারের কানে ঢুকলো। এর অর্থ কি, কি জবাব দিতে হবে, কিছুই মনে এলো না। নির্জন সাগর সৈকতের চারপাশে যেন ঘুরে বেড়াতে লাগলো তরুণীর কণ্ঠস্বর। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী, তার কণ্ঠস্বরও সুন্দর বীণার স্বরের মতো। হৃদয়তন্ত্রী মাঝে সৌন্দর্যের লয় মিলতে লাগলো।

তরুণী কোনো উত্তর না পেয়ে বললো, 'এসো।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলো সে। এমন লঘু পায়ে যে, হাঁটছে না বাতাসে ভেসে যাচ্ছে বোঝা যায় না। কলের পুতুলের মতো অনুসরণ করলো নবকুমার। ঘোরের ভেতর হেঁটে চলেছে যেন।

এভাবে কতক্ষণ হেঁটেছে তা জানে না নবকুমার। এক জায়গায় এসে একটা ছোট্ট বনের আড়ালে চলে গেল তরুণী। দ্রুত পায়ে বনটা পেরোলো নবকুমারও। কিন্তু তরুণীকে আর দেখতে পেলো না। সামনেই কাপালিকের কুটির।

ছয়

কাপালিকসঙ্গে

কুটিরে ঢুকে কোনো রকমে দরজা বন্ধ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো নবকুমার। খুব শিগগির আর মাথা তুলতে পারলো না।

'একি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়া?!' এই একটা প্রশ্নই খেলা করে বেড়াচ্ছে ওর মাথার ভেতর। কোনো জবাব পাচ্ছে না।

অন্যমনস্ক ছিলো বলে একটা বিষয় খেয়াল করেনি নবকুমার, ও আসার আগে থেকেই একটা কাঠ জ্বলছে কুটিরে। পরে অনেক রাতে যখন স্মরণ হলো সন্ধ্যাহ্নিক করা হয়নি তখন ভাবনা চিন্তা বাদ দিয়ে উঠলো ও। কলসিতে জল আছে কিনা দেখতে গিয়ে খেয়াল হলো, শুধু আলো নয়, চাল এবং রান্না করার মতো আরো কিছু জিনিসও রয়েছে কুটিরে। খুব একটা বিস্মিত হলো না ও। ভাবলো, এ-ও কাপালিকের কাজ—এ জায়গায় বিস্ময়ের কি আছে?

সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করলো নবকুমার। একটা মাটির পাত্র পাওয়া গেল কুটিরে। চালগুলো তাতে সিদ্ধ করে খেয়ে নিলো। বাঘছালের বিছানা পাতাই ছিলো। শুয়ে পড়লো ও।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সাগরতীরের দিকে চললো নবকুমার। আগের দিনের যাওয়া আসায় মোটামুটি চেনা হয়ে গিয়েছে পথ। আজ বেশি কষ্ট হলো না। সাগরের পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ও। কিন্তু কার জন্যে অপেক্ষা? আগের দিন সন্ধ্যায় দেখা মায়াবিনী আবার আসবে এখানে এই আশায়?

হয়তো হ্যাঁ, হয়তো না। যা-ই হোক না কেন সাগরতীর ছেড়ে নড়তে পারলো না নবকুমার। কাল সন্ধ্যার মতো বসে রইলো বালকাবেলায়।

দেখতে দেখতে বেলা অনেক হয়ে গেল। কেউ এলো না। তখন সৈকতেরই চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো নবকুমার। তীব্র আকুতিতে কিছু একটা খুঁজছে ওর চোখ। কিন্তু হা-হুতোস্মি। মানুষের ছায়াটাও দেখতে পেলো না। আবার এসে বসলো আগের জায়গায়।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়েছে। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হতে চললো। সূর্য ডুববে একটু পরেই। বসে আছে নবকুমার। প্রকৃতির শোভা দেখায় আজ আর মন নেই ওর। সূর্য ডুবে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর হতাশ মনে কুটিরের পথ ধরলো নবকুমার।

কুটিরে ফিরে দেখলো, নিঃশব্দে মাটিতে বসে আছে কাপালিক। নবকুমারকে দেখার পরও কোনো ভাবান্তর হলো না তার। নবকুমারই আগে জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন আছেন?'

উত্তর দিলো না কাপালিক। যেমন ছিলো তেমন বসে রইলো।

'এই দু'দিন প্রভুর দর্শন পাইনি কেন?' আবার জানতে চাইলো নবকুমার।

'নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম,' কাপালিকের জবাব।

বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলো নবকুমার। বললো, 'পথ জানি না, পাথেয় কিছুই নেই। প্রভু সব ব্যবস্থা করে দেবেন, এই ভরসায় আছি।'

একটা মাত্র কথা বললো কাপালিক, 'আমার সঙ্গে এসো।'

উঠে দাঁড়িয়ে কুটির ছেড়ে বেরোলো সন্ন্যাসী। বাড়ি ফেরার কোনো উপায় হয়তো এবার হবে এই ভেবে পেছন পেছন চললো নবকুমার।

সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলো পুরোপুরি নিভে যায়নি এখনো। আগে আগে যাচ্ছে কাপালিক। কয়েক পা পেছনে থেকে অনুসরণ করছে নবকুমার। হঠাৎ একটা কোমল হাতের স্পর্শ পেলো ও পিঠের ওপর। চমকে পেছন ফিরে যা দেখলো তাতে মুহূর্তে জমে যেন পাথর হয়ে গেল নবকুমারের শরীর। কালকের সেই মোহিনী বনদেবী মূর্তি, যার দেখা পাওয়ার জন্যে আজ সারাদিন সাগর সৈকতে কাটিয়েছে ও। আগের মতোই নিঃশব্দ নিস্পন্দ। কোথা থেকে হঠাৎ এ মূর্তি এলো ওর পেছনে? দু'ঠোঁটের ওপর আঙুল দিয়ে আছে তরুণী। বুঝলো নবকুমার, কথা বলতে নিষেধ করছে। অবশ্য এই ইঙ্গিতের খুব একটা প্রয়োজন ছিলো না। কি কথা বলবে নবকুমার? নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ও।

এসবের কিছুই দেখতে পায়নি কাপালিক। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল চোখের আড়ালে। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো দুজন। যখন নিশ্চিত হলো, এখন কথা বললে কাপালিক শুনতে পাবে না তখন মৃদু স্বরে কথা বললো তরুণী।

নবকুমারের কানে এই শব্দগুলো ঢুকলো: 'কোথায় যাচ্ছ? যেও না। ফিরে যাও—পালাও!'

আর একটা কথাও না বলে সরে গেল তরুণী। জবাবের জন্যে অপেক্ষা করলো না।

কিছুক্ষণ অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো নবকুমার। একবার ভাবলো পেছন

পেছন যাবে। কিন্তু কার পেছন পেছন? রমণী কোন্‌দিকে গেছে কিছু বুঝতে পারেনি। ভাবলো, 'এ কারো মায়া? না আমারই ভুল হয়েছে। যে কথা শুনলাম—সে তো ভয়ের, কিন্তু কিসের ভয়? তান্ত্রিকেরা সবই করতে পারে। তা হলে কি পালাবো? পালাবোই বা কেন? সেদিন যখন বেঁচে গেছি, আজও বাঁচবো। কাপালিকও মানুষ, আমিও মানুষ। সুতরাং ভয় কী?'

এসব কথা ভাবছে নবকুমার, এমন সময় দেখলো, পেছনে তাকে না দেখে ফিরে এসেছে কাপালিক।

'দেরি করছো কেন?' জিজ্ঞেস করলো সে।

কিছু না বলে আবার কাপালিকের পেছন পেছন চললো নবকুমার।

কিছু দূর যাওয়ার পর সামনে একটা মাটির দেয়ালওয়ালা কুটির দেখতে পেলো। সেটাকে কুটিরও বলা যেতে পারে, ছোট বাড়িও বলা যেতে পারে। তার ঠিক পেছনেই বালিময় সাগরতীর। কুটিরের পাশ দিয়ে সেই সৈকতের দিকে চললো কাপালিক। নিঃশব্দে অনুসরণ করলো নবকুমার। হঠাৎ সে খেয়াল করলো একটু আগে দেখা সেই তরুণী দ্রুত তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় কানে কানে বলে গেল, 'এখনও পালাও! নরমাংস না হলে কাপালিকের পূজা হয় না, জানো না?'

মুহূর্তে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো নবকুমারের। এই শীতের রাতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলো কপালে। এদিকে, ভাগ্য খারাপ ওর, যুবতীর কথা কানে গেছে কাপালিকের।

'কপালকুণ্ডলে!' বজ্র কঠিন গলায় ডাকলো সন্ন্যাসী।

কোনো জবাব দিলো না কপালকুণ্ডলা। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো একপাশে।

পিছিয়ে এসে লোহার মতো শক্ত হাতে নবকুমারের হাত ধরলো কাপালিক। টেনে নিয়ে যেতে লাগলো সৈকতের দিকে।

মানুষঘাতী হাতের স্পর্শে রক্তে আগুন ধরে গেল নবকুমারের। লুপ্ত সাহস ফিরে এলো আবার। 'হাত ছাড়ুন আমার,' শান্ত-কঠিন গলায় ও বললো।

কিছু বললো না কাপালিক। হাতও ছাড়লো না।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?' আবার জিজ্ঞেস করলো নবকুমার।

'পূজার জায়গায়।'

'কেন?'

'বলি দেয়ার জন্যে।'

তীব্র এক ঝাঁকুনিতে হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো নবকুমার। যে জোরে ও ঝাঁকি দিয়েছে, সাধারণ কেউ হলে হাত ধরে থাকা দূরের কথা, ছিটকে পড়তো মাটিতে। কিন্তু কাপালিক সামান্য নড়লো না পর্যন্ত। নবকুমারের কব্জী তার হাতেই ধরা রইলো। উল্টো ওর হাতের হাড়গুলোই মড়মড়িয়ে উঠলো।

শক্তিপ্রয়োগে কাজ হবে না, বুঝলো নবকুমার। কৌশলের দরকার। ঠিক আছে, দেখা যাক এ ব্যাটার দৌড় কতটুকু, ভেবে কাপালিকের সঙ্গে চললো ও।

সৈকতের মাঝামাঝি পৌঁছে দেখলো, আগের দিনের মতো কাঠ জেলে বিরাট একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হয়েছে। চারপাশে তান্ত্রিক পূজার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সব সাজানো। মাথার খুলি ভর্তি আসবও রয়েছে, কিন্তু শব নেই। ওকেই আজ শব হতে হবে, অনুমান করলো নবকুমার।

শুকনো, শক্ত কিছু লতাগুল্ম আগে থেকেই সাজানো ছিলো সেখানে। সেগুলো দিয়ে শক্ত করে নবকুমারকে বাঁধতে লাগলো কাপালিক। সাধ্যমতো বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো নবকুমার, কিন্তু লাভ হলো না বিশেষ। এ বয়েসেও মত্ত হাতির শক্তি কাপালিকের দেহে। ওর বাধা দেয়ার চেষ্টা দেখে সে তাচ্ছিল্যের একটা হাসি হাসলো শুধু।

'মূর্খ। কি জন্যে বাধা দিচ্ছো?' বললো কাপালিক। 'তোমার জন্ম আজ সার্থক হবে। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হবে, তোমার মতো লোকের পক্ষে এর চেয়ে সৌভাগ্যের আর কি হতে পারে?'

শক্ত করে বেঁধে নবকুমারকে সৈকতের ওপর ফেলে রাখলো কাপালিক। তারপর বলি দেয়ার আগে যেসব ক্রিয়াকর্ম করতে হয় সেগুলো করতে লাগলো।

বাঁধন ছেঁড়বার চেষ্টা করছে নবকুমার। কিন্তু লাভ হচ্ছে না। সম্ভবত হবেও না। ভীষণ শক্ত শুকনো লতা, বাঁধনও মজবুত। মৃত্যুর আর দেরি নেই। ইষ্ট দেবতার চরণে হৃদয় সঁপে দিলো ও। জন্মভূমির কথা মনে পড়লো একবার। বাড়ির কথা মনে পড়লো। মা এবং বহুদিন আগে মারা যাওয়া বাবার মুখ মনে পড়লো। দুই এক বিন্দু অশ্রু শুষে নিলো শুকনো বালুকাবেলা।

ক্রিয়াকর্ম শেষ করে খড়গ নেয়ার জন্যে উঠলো কাপালিক। কিন্তু যেখানে রেখেছিলো সেখানে পেলো না খড়গ। আশ্চর্য হলো কাপালিক। কোথায় গেল জিনিসটা? স্পষ্ট মনে আছে তার, বিকেলে খড়গ এনে জায়গামতো রেখেছিলো, এবং তার পরে কোথাও সরায়নি। তা হলে কি হলো ওটা?

আশপাশে যেখানে যেখানে থাকতে পারে সব জায়গায় খুঁজলো কাপালিক। কোথাও পেলো না। নিশ্চয়ই কপালকুণ্ডলার কাজ, ভেবে বিরক্তমুখে মাটির কুটিরটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকলো, 'কপালকুণ্ডলা! কপালকুণ্ডলা!'

বার বার ডাকার পরও কোনো উত্তর দিলো না মেয়েটা। ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠলো কাপালিকের। রাগে লাল হয়ে উঠলো চোখদুটো। দ্রুত পায়ে কুটিরের দিকে চললো সে।

এই ফাঁকে নবকুমার আর একবার চেষ্টা করলো লতার বাঁধন ছিঁড়তে। এবারও ব্যর্থ হতে হলো ওকে। লতা এবং বাঁধন দুটোই বড় শক্ত।

কাছেই বালির ওপর কোমল পায়ের আলতো শব্দ হলো একটা। এ পদশব্দ কাপালিকের হতেই পারে না। অনেক কষ্টে ঘাড় ফেরাতে পারলো নবকুমার। দেখলো, সেই মোহিনী—কপালকুণ্ডলা। খড়গ দুলছে তার হাতে।

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলতে গেল নবকুমার। থামিয়ে দিলো ওকে কপালকুণ্ডলা। 'চুপ! কথা বোলো না। খড়গ আমার কাছে। চুরি করে রেখেছি।'

হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লো ও। দ্রুতহাতে খড়গ দিয়ে নবকুমারের হাত

পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে বললো, 'পালাও এক্ষুণি। আমার পেছন পেছন এসো, পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।'

তীরের বেগে পথ দেখিয়ে চললো কপালকুণ্ডলা। লাফ দিয়ে তার পেছন পেছন এগোলো নবকুমার।

সাত

অন্বেষণ

কুটিরে এসে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো কাপালিক। পেলো না খড়গ। কপালকুণ্ডলাকেও দেখলো না কোথাও। সন্দেহ দানা বেঁধে উঠতে লাগলো তার মনে। আর খোঁজা অর্থহীন ভেবে ফিরে এলো সৈকতে।

এবার ভীষণভাবে অবাক হতে হলো তাকে। যেখানে রেখে গিয়েছিলো সেখানে নেই নবকুমার। শুকনো লতার ছেঁড়া টুকরোগুলোর দিকে চোখ পড়তেই বুঝে ফেললো কি ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে নবকুমারের খোঁজে রওনা হলো সে।

চার দিকে তাকাতে তাকাতে চলেছে কাপালিক। কিন্তু নির্জন সৈকত ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লো না তার। গাঢ় আঁধার চারদিকে। বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। কোন্ দিকে, কোন্ পথে গিয়েছে পলাতকরা কিছুই ঠিক করতে পারলো না সে।

হাঁটতে হাঁটতে মোহনার কাছাকাছি চলে এলো কাপালিক। হঠাৎ মনে হলো, দূরে যেন কথাবার্তা শোনা গেল কারো। শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলো সে। কিন্তু ততক্ষণে সাগর গর্জনের তলে চাপা পড়ে গেছে শব্দ। কি করা যায় ভাবছে, এমন সময় চোখ গেল সামনে একটা উঁচু বালিয়াড়ির দিকে। চারদিকটা ভালো করে দেখার জন্যে সেটার ওপর উঠতে শুরু করলো কাপালিক। বালিয়াড়িটার যে পাশ দিয়ে সে উঠলো, তার বিপরীত পাশটার গোড়া যে বর্ষার জলপ্রবাহে ক্ষয় হয়ে গেছে তা জানতো না কাপালিক। চূড়ায় ওঠার সাথে সাথেই তার শরীরের ওজনে নদীর জলে ভেঙে পড়লো ক্ষয়ে যাওয়া বালিয়াড়ি। সেই সাথে তীরবিদ্ধ মহিষ যেমন পড়ে যায় পাহাড়চূড়া থেকে তেমনি পড়ে গেল কাপালিকও।

আট

আশ্রয়ে

অমাবস্যার রাত। ঘোর অন্ধকার চারদিক। ঊর্ধ্বশ্বাসে বনের ভেতর ঢুকলো দুজন। বনপথ নবকুমারের অপরিচিত। সহচারিণী ষোড়শীর পেছন পেছন যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। একবার মনে মনে ভাবলো, 'এ-ও কপালে ছিলো!'

একটু একটু করে ওদের চলার গতি ধীর হয়ে এলো। অন্ধকারে কিছু দেখা

যাচ্ছে না। কেবল কখনো কোথাও তারার আলোতে কোনো বালুকাস্তূপের শুভ্র শিখর অস্পষ্ট চোখে পড়ছে। হঠাৎ হঠাৎ কোথাও জোনাকির আলো মিটমিট করে জ্বলে উঠেই নিভে যাচ্ছে।

পথিককে নিয়ে বনের একেবারে গভীরে চলে এলো কপালকুণ্ডলা। রাত্রির এখন দ্বিতীয় প্রহর। সামনে অস্পষ্টভাবে উঁচু একটা দেবালয়চূড়া দেখা গেল এই সময়। পাশেই ইঁটের তৈরি প্রাচীর ঘেরা একটা বাড়ি। নবকুমারকে প্রাচীরের আড়ালে দাঁড় করিয়ে রেখে প্রাচীরদরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো কপালকুণ্ডলা। ধাক্কা দিলো দরজায়।

বেশ কিছুক্ষণ দরজা ধাক্কানোর পর ভেতর থেকে এক লোকের গলা শোনা গেল, 'কে ও, কপালকুণ্ডলা বুঝি?'

'দ্বার খোলো,' জবাব দিলো কপালকুণ্ডলা।

একটু পরেই খুলে গেল দরজা। যে খুললো তাকে দেখে ঐ মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতার সেবক বা অধিকারী বলে মনে হলো নবকুমারের। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। প্রায় চুলহীন মাথা। লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল কপালকুণ্ডলা। ফিসফিস করে দু চার কথায় বুঝিয়ে দিলো সঙ্গীর অবস্থা।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন অধিকারী। সম্ভবত ভাবছেন কিছু। শেষে বললেন, 'ব্যাপার বেশ গুরুতরই মনে হচ্ছে। মহাপুরুষ ইচ্ছে করলে সবই করতে পারেন। যাহোক, মায়ের প্রসাদে তোমার অমঙ্গল কিছু ঘটবে না। সে লোকটা কোথায়?'

'প্রাচীরের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ডেকে আনছি।'

ছুটে দেয়ালের আড়ালে চলে এলো কপালকুণ্ডলা। নবকুমারের উদ্দেশ্যে বললো, 'এসো।'

নবকুমারকে নিয়ে ও প্রাচীর দরজার কাছে ফিরে আসতে দুজনকে ভেতরে আহ্বান করলেন অধিকারী। 'আজ রাতটা কোনোমতে লুকিয়ে থাকো এখানে,' বললেন তিনি। 'কাল ভোরে তোমাকে মেদিনীপুরের পথে রেখে আসবো।'

কথায় কথায় অধিকারী জানতে পারলেন, এখন পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া হয়নি নবকুমারের। সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। বিনীতভাবে নবকুমার জানালো, খাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই ওর, বিশ্রামের জন্যে একটা জায়গা পেলেই চলবে আপাতত।

নিজের রান্নাঘরে নবকুমারের বিছানা করে দিলেন অধিকারী। ও শুয়ে পড়ার পর সমুদ্রতীরে ফিরে আসার জন্যে তৈরি হলো কপালকুণ্ডলা।

'যেও না,' সস্নেহে বললেন অধিকারী! 'একটু দাঁড়াও। একটা কথা আছে।'

'কি?'

'আমার মনে হয় ওখানে আর ফিরে যাওয়া উচিত হবে না তোমার।'

'কেন?'

'গেলে আর রক্ষা থাকবে না।'

'তা তো জানি।'

'তা হলে আর জিজ্ঞেস করো কেন?'

'ওখানে ছাড়া আর কোথায় যাব? দুনিয়ার আর কোথাও তো আমার যাওয়ার জায়গা নেই।'

'এই পথিকের সাথে অন্য দেশে চলে যাও।'

নীরবে দাঁড়িয়ে আছে কপালকুণ্ডলা।

'মা, কি ভাবছো?' আবার জিজ্ঞেস করলেন অধিকারী।

'যখন তোমার শিষ্য আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো, তখন বলেছিলে, যুবতীর এরকম যুবক পুরুষের সাথে যাওয়া উচিত নয়। এখন বলছো কেন?'

'তখন তোমার জীবনের আশঙ্কা করিনি। বিশেষ করে তখন যে সদুপায়ের সম্ভাবনা ছিলো না এখন তা হতে পারবে। চলো, মায়ের অনুমতি নিয়ে আসি।'

প্রদীপ হাতে মন্দিরের দিকে চললেন অধিকারী। আর কিছু না বলে পেছন পেছন চললো কপালকুণ্ডলা। কাপালিকের আশ্রমে ফিরে গেলে কি হতে পারে তা ভালোই অনুমান করতে পারছে ও।

দেবালয়ের দ্বারে পৌঁছে দরজা খুললেন অধিকারী। কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। পূর্ণ বয়স্ক মানুষের আকারের এক করাল কালীমূর্তি স্থাপিত মন্দিরে। ভক্তির সাথে প্রণাম করলেন দুজন। হাত মুখ ধুয়ে পবিত্র হয়ে নিলেন অধিকারী। ফুলের পাত্র থেকে একটা অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র নিয়ে মন্ত্রপূত করলেন। প্রতিমার পায়ের ওপর রেখে তাকিয়ে রইলেন সেটার দিকে।

কিছুক্ষণ পর অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে বললেন, 'দেখ, মা, দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন! বেলপাতা পড়েনি! যে ইচ্ছা নিয়ে অর্ঘ্য দিয়েছিলাম, তাতে অবশ্যই মঙ্গল হবে। তুমি স্বচ্ছন্দে এই পথিকের সাথে যেতে পারো। তবে আমি সংসারী লোকের রীতি-চরিত্র জানি। তুমি যদি গলগ্রহ হয়ে এ লোকের সাথে যাও তবে ও অপরিচিত যুবতী সঙ্গে নিয়ে লোকালয়ে লজ্জা পাবে। তোমাকেও লোকে ঘৃণা করবে। তুমি বলছো এ লোক ব্রাহ্মণসন্তান, গলায়ও পৈতে দেখেছি। ও যদি তোমাকে বিয়ে করে নিয়ে যায়, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। তা না হলে আমিও তোমাকে ওর সাথে যেতে বলতে পারি না।'

'বি-য়ে!' অত্যন্ত ধীরে কথাটা উচ্চারণ করলো কপালকুণ্ডলা। 'বিয়ের নাম তো তোমাদের মুখে শুনে থাকি, কিন্তু কাকে বলে বিশেষ জানি না। কি করতে হবে?'

অধিকারী একটু হেসে বললেন, 'বিয়ে স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান। এজন্যেই স্ত্রীকে সহধর্মিনী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।'

অধিকারী ভাবলেন, সবই বুঝালেন। কপালকুণ্ডলা ভাবলো, সবই বুঝলো।

'তা-ই হোক,' বললো ও। 'কিন্তু তাঁকে ছেড়ে যেতে আমার মন সরছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করেছেন।'

'কি জন্যে প্রতিপালন করেছে তা জানো না?'

এই বলে অধিকারী তান্ত্রিক সাধনায় মেয়েদের যে সম্বন্ধ, তা অস্পষ্টভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিছুই বুঝলো না কপালকুণ্ডলা, কিন্তু তার বড় ভয়

হলো। বললো, 'তবে বিয়েই হোক।'

মন্দির থেকে বেরিয়ে আগের সেই বাড়িতে ফিরে এলেন দুজন। একটা ঘরে কপালকুণ্ডলাকে বসিয়ে নবকুমারের বিছানার পাশে এসে বসলেন অধিকারী।

'মহাশয়! ঘুমিয়েছেন কি?' নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ঘুমানোর মতো অবস্থা নয় নবকুমারের। নিজের দুরবস্থার কথা ভাবছিলো শুয়ে শুয়ে।

'আজ্ঞে না,' জবাব দিলো ও।

'মহাশয়ের পরিচয়টা জানতে এলাম। আপনি ব্রাহ্মণ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোন্ শ্রেণী?'

'রাঢ়ীয়।'

'আমরাও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ,' বললেন অধিকারী, 'উৎকল ব্রাহ্মণ ভাববেন না। বংশে কুলাচার্য্য, তবে এখন মায়ের পদাশ্রয়ে আছি। মহাশয়ের নাম?'

'নবকুমার শর্ম্মা।'

'নিবাস?'

'সপ্তগ্রাম।'

'আপনারা কোন গাঁই (ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ)?'

'বন্দ্যঘটী।'

'কয় সংসার করেছেন?'

'এক সংসার মাত্র।'

সব কথা খুলে বললো না নবকুমার। আসলে ওর এক সংসারও নেই। রামগোবিন্দ ঘোষালের মেয়ে পদ্মাবতীকে বিয়ে করেছিলো ও। বিয়ের পর কিছুদিন বাপের বাড়িতে ছিলো পদ্মাবতী। মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া আসা করতো। যখন তার বয়েস তের বছর তখন তার বাবা সপরিবারে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়েছিলেন। সেই সময় পাঠানরা আকবর শাহ্‌র কাছে পরাজিত হয়ে বাঙলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলো। সদলে উড়িষ্যায় বসবাস করছিলো তারা। তাদের দমনের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন আকবর শাহ্। রামগোবিন্দ ঘোষাল যখন উড়িষ্যা থেকে ফিরছিলেন তখন মোগল পাঠানের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পথে পাঠানসেনার হাতে পড়েন রামগোবিন্দ। পাঠানরা সে সময় নিছক টাকা কড়ির জন্যেই পথিকদের ওপর চড়াও হতো। টাকা-পয়সা, গহনা-গাটি প্রভৃতি মূল্যবান জিনিসপত্র কেড়ে রেখে ছেড়ে দিতো তাদের। কিন্তু রামগোবিন্দ ঘোষালের স্বভাব ছিলো উগ্র। চোট-পাট করে চটিয়ে দিলেন পাঠানদের। ফল হলো এই, সপরিবারে আটকা পড়লেন তিনি। অবশেষে জাতীয় ধর্ম বিসর্জন দিয়ে সপরিবারে মুসলমান হয়ে নিষ্কৃতি পেলেন।

রামগোবিন্দ ঘোষাল সপরিবারে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন বটে, কিন্তু মুসলমান বলে আত্মীয় স্বজনের কাছে পরিত্যক্ত হলেন একেবারে। এ সময় নবকুমারের বাবা বেঁচে ছিলেন। জাত খোয়ানো বেয়াইয়ের সাথে সাথে জাত খোয়ানো পুত্রবধুকেও

ত্যাগ করলেন তিনি। নবকুমারের সাথে পদ্মাবতীর আর দেখা হয়নি।

স্বজন পরিত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হয়ে বেশি দিন দেশে বাস করতে পারলেন না রামগোবিন্দ ঘোষাল। সপরিবারে রাজধানী রাজমহলে গিয়ে বসতি স্থাপন করলেন। রাজমহলে যাওয়ার পর শ্বশুর বা স্ত্রীর খোঁজ জানার কোনো উপায় রইলো না নবকুমারের। এ পর্যন্ত জানতেও পারেনি কিছু। সংসারের প্রতি এমন এক ধরনের বৈরাগ্য এসে গেল যে ও আর বিয়ে করলো না।

অধিকারী এসব কিছুই জানতেন না। ভাবলেন, কুলীনের ছেলের দুই বিয়েতে আপত্তি কি?

'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম,' বললেন তিনি। 'এই যে মেয়েটা আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছে—পরোপকার করতে গিয়ে নিজের প্রাণসংশয় দেখা দিয়েছে ওর। যে মহাপুরুষের আশ্রয়ে ওর বাস, তাঁর স্বভাবটা ভয়ঙ্কর। ফিরে গেলে আপনার যে দশা ঘটছিলো ওরও তা-ই হবে। এর কোনো বিহিত করতে পারেন কি না ভেবে দেখুন।'

উঠে বসলো নবকুমার।

'আমিও সেই ভয় করছিলাম। আপনি সবই জানেন, আপনিই বলে দিন কি করবো? নিজের জীবন দিয়েও যদি কিছু করতে হয় তো আমি রাজি আছি। ঐ নরঘাতকের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলে যদি কপালকুণ্ডলার প্রাণ বাঁচে তো তা-ও করতে পারি আমি।'

হাসলেন অধিকারী। 'পাগল! কি লাভ হবে তাতে? আপনার প্রাণ তো যাবেই, মেয়েটারও প্রাণ যাবে। এর একটা উপায় আছে…।'

'কি সে উপায়?'

'আপনার সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারে কপালকুণ্ডলা। কিন্তু সে কাজটাও খুব সহজ হবে না। আমার এখানে থাকলে দু'এক দিনের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবেন দু'জন। এই মন্দিরে প্রায়ই আসেন উনি। তার মানে কপালকুণ্ডলার কপাল খারাপ।'

'আমার সাথে পালানোটা সহজ হবে না কেন?' আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করলো নবকুমার।

'ও কার মেয়ে, কোন্ কুলে জন্ম, তার কিছুই আপনি জানেন না। কার পত্নী, কেমন চরিত্র তা-ও কিছু জানেন না। আপনি ওকে সঙ্গে নেবেন কেন? যদি বা নিলেন, আপনি কি ওকে নিজের বাড়িতে জায়গা দেবেন? দিলেও, কেন?' আর যদি না-ই দেন, এ অনাথা কোথায় যাবে?'

একটু ভাবলো নবকুমার। তারপর বললো, 'যে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তার জন্যে কোনো কাজ করতেই আমি পিছ পা নই। আমার পরিবারের আর সবার সাথে থাকবেন উনি।'

'ভালো কথা। কিন্তু যখন আপনার আত্মীয়-স্বজন জিজ্ঞেস করবেন, এ কার স্ত্রী, কি উত্তর দেবেন?'

আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করলো নবকুমার।

'আপনিই বলুন, ওর আসল পরিচয় কি। সেই পরিচয়ই আমি সবাইকে দেব।'

'বেশ। কিন্তু এই চোদ্দ পনর দিনের পথ যুবক যুবতী আপনারা কি পরিচয়ে এক সাথে যাবেন? লোকে কি বলবে? তা ছাড়া আমি এই মেয়েকে মা বলেছি, আমিই বা কিভাবে ওকে অপরিচিত এক যুককের সাথে একা একা দূর দেশে পাঠাবো?'

ঘটকরাজ ঘটকালিতে মন্দ নয়।

'আপনিও তাহলে আসুন আমার সাথে,' বললো নককুমার।

'আমি সঙ্গে যাব? তাহলে ভবানীর পূজা করবে কে?'

ক্ষুব্ধ হলো নবকুমার। 'তাহলে কি কোনো উপায় নেই?'

'একটা উপায় আছে। কিন্তু আপনার উদারতার ওপর নির্ভর করছে সেটা।'

'সে কি? কোন্ কাজটা করতে অরাজি হয়েছি আমি? কি উপায় বলুন?'

'শুনুন, কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণের মেয়ে। ওর জীবনের সব কথাই আমি জানি। খুব ছোট বেলায় খ্রীষ্টান দস্যুরা ওকে চুরি করে আনে। সাগর পথে যখন দস্যুরা পালাচ্ছিলো তখন হঠাৎ ভেঙে পড়ে ওদের জাহাজ। সম্ভবত ঝড়ে পড়েছিলো। ছোট্ট কপালকুণ্ডলাকে সাগরতীরে ফেলে চলে যায় ওরা। কাপালিক ওকে দেখে নিজের যোগসিদ্ধির ইচ্ছায় লালনপালন করতে থাকেন। খুব শিগগিরই নিজের প্রয়োজন মেটাতেন। এখন পর্যন্ত বিয়ে হয়নি ওর, চরিত্র পরম পবিত্র। আপনি ওকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যান। কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। শাস্ত্র মতো বিয়ে দেব আমি।'

কোনো জবাব দিতে পারলো না নবকুমার। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। পায়চারি করতে লাগলো চিন্তিত মুখে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন অধিকারী। তারপর বললেন, 'আপনি এখন ঘুমান। কাল ভোরে আপনাকে জাগিয়ে দেব। ইচ্ছে হলে একা একা যাবেন। মেদিনীপুরের পথে রেখে আসবো আপনাকে।'

বিদায় নিলেন অধিকারী। যাওয়ার সময় মনে মনে বললেন, 'রাঢ় দেশের ঘটকালি ভুলে গেছি নাকি?'

নয়

দেবনিকেতনে

ভোরে নবকুমারের কাছে এলেন অধিকারী। দেখলেন, আর শোয়নি নবকুমার, এখনো সেই ভাবে পায়চারি করে চলেছে।

'এখন কি করবেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আজ থেকে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্মপত্নী। এর জন্যে যদি সংসার ত্যাগ করতে হয়, তা-ও করবো। কে কন্যা সম্প্রদান করবে?'

হাসি আর ধরে না ঘটক চূড়ামণির মুখে। মনে মনে ভাবলেন, এতদিনে

জগদম্বার কৃপায় আমার কপালিনীর বুঝি গতি হলো।

'আমিই সম্প্রদান করবো,' বললেন তিনি।

নিজের শোয়ার ঘরে ফিরে এলেন অধিকারী। একটা খুঙ্গীর ভেতর কয়েক খণ্ড অত্যন্ত জীর্ণ তালপাতার পুঁথি আছে। তাতে তাঁর তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি সংরক্ষিত থাকে। ভালো করে সেগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখলেন তিনি। ফিরে এসে বললেন, 'আজ যদিও বিয়ের দিন নেই, তবু কোনো অসুবিধা হবে না। গোধূলিলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করবো। তুমি আজ উপবাস করবে। কৌলিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলো বাড়ি গিয়ে কোরো। এক দিনের জন্যে তোমাদের লুকিয়ে রাখতে পারি, এমন জায়গা আছে। আজ যদি তিনি আসেন, তোমাদের খোঁজ পাবেন না। বিয়ের পরে কাল সকালে সপত্নীক বাড়ি যেও।'

সম্মত হলো নবকুমার। এ অবস্থায় যতদূর সম্ভব ততদূর শাস্ত্রমতো কাজ হলো। গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সাথে কাপালিকপালিতা সন্ন্যাসিনীর বিয়ে হয়ে গেল।

কাপালিকের কোনো সংবাদ নেই। পরদিন ভোরে তিনজনে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। অধিকারী মেদিনীপুরের পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবেন ওদের।

রওনা হওয়ার আগে কালীপ্রণামে গেল কপালকুণ্ডলা। ভক্তির সাথে প্রণাম করে, পুষ্পপাত্র থেকে একটা বিল্বপত্র নিয়ে প্রতিমার পায়ের ওপর রাখলো। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সে পাতাটার দিকে। পায়ের ওপর থেকে পড়ে গেল বিল্বপত্র।

ভয় পেয়ে গেল কপালকুণ্ডলা। মন্দির থেকে বেরিয়ে এলো তাড়াতাড়ি। অধিকারীর কাছে এসে জানালো বেলপাতা পড়ে যাওয়ার কথা।

সব শুনে বিষণ্ণ হলেন অধিকারীও। বললেন, 'এখন নিরুপায়। বিয়ের পর স্বামীই তোমার একমাত্র ধর্ম। স্বামী শ্মশানে গেলে সাথে যেতে হবে তোমাকে। সুতরাং নিঃশব্দে চলো।'

নিঃশব্দে চললো সবাই। মেদিনীপুরের পথ পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেলা হয়ে গেল অনেক। এবার বিদায় নেবেন অধিকারী। কাঁদতে লাগলো কপালকুণ্ডলা। পৃথিবীতে যে মানুষটা ওর একমাত্র সুহৃদ, তিনি বিদায় নিচ্ছেন।

কাঁদতে লাগলেন অধিকারীও। চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে কপালকুণ্ডলার কানে কানে বললেন, 'মা! তুই জানিস, পরমেশ্বরীর প্রসাদে তোর সন্তানের অর্থের অভাব নেই। হিজলীর ছোট বড় সবাই তাঁর পূজা দেয়। তোর কাপড়ে যা বেঁধে দিয়েছি তা তোর স্বামীর কাছে দিয়ে তোকে পাল্কী করে দিতে বলিস। আর আমাকে সন্তান বলে মনে করিস।'

বলতে বলতে হু হু করে কেঁদে ফেললেন অধিকারী। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে চলতে লাগলেন মন্দিরের পথে। কপালকুণ্ডলাও কাঁদতে কাঁদতে চললো স্বামীর পেছন পেছন।

দ্বিতীয় খণ্ড

এক

রাজপথে

মেদিনীপুরে পৌঁছে অধিকারীর দেওয়া টাকায় কপালকুণ্ডলার জন্যে একজন দাসী, একজন প্রহরী এবং পাল্কী ভাড়া করলো নবকুমার। স্ত্রীকে পাল্কীতে রওনা করে দিয়ে হেঁটে চললো ও। নিজের জন্যে আর একটা পাল্কী হলে খুব ভালো হতো নিঃসন্দেহে, কিন্তু তার উপায় নেই, কপালকুণ্ডলার জন্যে দাসী, পাল্কী আর রক্ষী ভাড়া করতেই বেরিয়ে গেছে অধিকারীর দেওয়া প্রায় সব টাকা।

আগের দিনের পরিশ্রমে খুব ক্লান্ত হয়ে আছে নবকুমার। দ্রুত হাঁটতে পারছে না। দুপুরের খাওয়ার পর বাহকরা ওকে ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে গেল। বিকেল হলো। তারপর সন্ধ্যা। শীতকালের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সন্ধ্যাও পেরিয়ে গেল একটু পরে। রাত নেমে এলো পৃথিবীতে। একটু পরে বৃষ্টি পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা। কপালকুণ্ডলার কাছে পৌছানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো নবকুমার। ভেবেছিলো প্রথম সরাইতেই দেখা হবে ওর সাথে। কিন্তু রাত প্রায় চার-পাঁচ দণ্ড হতে চললো, প্রথম সরাইয়ের দেখা নেই এখনো। দ্রুত পা চালালো ও।

হঠাৎ শক্ত কিছু একটার ওপর পা পড়লো ওর। পায়ের চাপে খড়-খড় মড়-মড় শব্দে ভেঙে গেল জিনিসটা। দাঁড়িয়ে পড়লো নবকুমার। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে আবার পা বাড়ালো। আবার খড়-মড় শব্দ। একটু ঝুঁকে পায়ের নিচ থেকে জিনিসটা তুললো ও। ভাঙা পাতলা তক্তার মতো মনে হলো।

চিন্তিত হয়ে পড়েছে নবকুমার। পথের ওপর এরকম তক্তা এলো কোত্থেকে? ভাবতে ভাবতে পা বাড়ালো সামনে। এবার একটু দূরে অন্ধকারে আবছাভাবে একটা বড় সড় জিনিস দেখতে পেলো ও। তাড়াতাড়ি একটু কাছে যেতে বুঝলো, ভাঙা পাল্কী সেটা। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো নবকুমারের হৃৎপিণ্ড। কপালকুণ্ডলার কোনো বিপদ হয়নি তো? আরেকটু এগোলো ও। নরম কিছু একটার ওপর পা পড়লো যেন, অনেকটা মানুষের শরীরের মতো! মাটিতে বসে পড়ে হাত বুলিয়ে দেখলো, মানুষেরই শরীর। ঠাণ্ডা। তরল পদার্থের স্পর্শও পেলো যেন নবকুমার। নাড়ী ধরে দেখলো, স্পন্দন নেই, মারা গেছে। মনে হয় অনেকক্ষণ আগে, নইলে এত ঠাণ্ডা হতো না মৃতদেহটা।

উঠতে যাবে নবকুমার, এমন সময় একটা নিশ্বাসের শব্দ যেন শুনতে পেলো। কান খাড়া করলো ও। হ্যাঁ, নিশ্বাসেরই শব্দ। আশ্চর্য! নিশ্বাস আছে, তাহলে নাড়ী নেই কেন? এ কি রোগী? নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখলো, নিশ্বাস বইছে না। তাহলে শব্দ আসছে কোত্থেকে? কাছেই জীবিত কেউ বোধহয় আছে, ভেবে

জিজ্ঞেস করলো, 'কেউ আছে নাকি এখানে?'

মৃদুস্বরে উত্তর হলো, 'আছি।'

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো নবকুমার।

পাল্টা প্রশ্ন হলো, 'তুমি কে?'

নবকুমারের কানে কণ্ঠস্বরটা রমণীর বলে মনে হলো। ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কপালকুণ্ডলা না কি?'

'কপালকুণ্ডলা কে তা জানি না—আমি আপাতত দস্যুহাতে নিষ্কুণ্ডলা হয়েছি।'

কপালকুণ্ডলা নয় শুনে একটু স্বস্তি পেলো নবকুমার। জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে?'

'ডাকাতরা আমার পাল্কী ভেঙে দিয়েছে, আমার এক বাহককে মেরে ফেলেছে, আর সবাই পালিয়ে গেছে। আমার সব গহনাগাটি নিয়ে আমাকে পাল্কীর সাথে বেঁধে রেখে গেছে।'

ভুরু কুঁচকে ভালো করে তাকালো নবকুমার। সত্যিই পাল্কীর সাথে বাঁধা রয়েছে যেন কি একটা। অবয়বটা স্ত্রীলোকের মতোই লাগছে। দ্রুতহাতে মেয়েটির বাঁধন খুলে দিলো ও। জিজ্ঞেস করলো, 'উঠতে পারবে তুমি?'

'আমাকেও একঘা লাঠি লাগিয়েছিলো,' বললো রমণী। 'পায়ে এখনো ব্যথা আছে। তবে একটু সাহায্য করলে বোধহয় পারবো।'

হাত বাড়িয়ে দিলো নবকুমার। সেই হাত ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো রমণী।

'হাঁটতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলো নবকুমার।

'আপনার পেছন পেছন কোনো পথিক আসছে কিনা দেখেছেন?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রমণী।

'না।'

'চটি কতদূর?'

'বলতে পারি না, তবে মনে হয় কাছেই।'

'অন্ধকারে একা একা মাঠে বসে কি করবো, আপনার সাথে চটি পর্যন্ত যাওয়াই ভালো। কিছু একটার ওপর ভর দিলে বোধহয় চলতে পারবো।'

'বিপদের সময় সংকোচ করে বোকারা। ইচ্ছে করলে আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলতে পারো।'

বোকামি করলো না রমণী। নবকুমারের কাঁধেই ভর করলো সে।

সত্যি কাছেই ছিলো চটি। অল্প সময়ের ভেতর সঙ্গিনীকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেল নবকুমার। কপালকুণ্ডলা এসে পৌঁছেছে কি না খোঁজ করলো প্রথমে। এসেছে শুনে স্বস্তির একটা নিশ্বাস ছাড়লো। দাসদাসীরা ওর জন্যে একটা ঘর ভাড়া করেছে। এখন সেখানেই আছে কপালকুণ্ডলা। নবকুমার সঙ্গিনীর জন্যে তারপাশে আরেকটা ঘর ভাড়া করলো। রমণীকে সে ঘরে ঢুকিয়ে চটিওয়ালাকে বাতি জ্বেলে আনতে বললো সে।

একটু পরেই বাতি জেলে আনলো চটিওয়ালার মেয়ে। সেই আলোয় দেখলো নবকুমার, অপূর্ব সুন্দরী রমণী। শ্রাবণের নদীর মতো উছলে পড়ছে যেন তার রূপরাশি।

দুই

পান্থনিবাসে

অপূর্ব সুন্দরী রমণীটি। তবে একটু খুঁতও আছে। যদি এই খুঁতটুকু না থাকতো তাহলে বলা যেত, 'পুরুষ পাঠক! ইনি আপনার স্ত্রীর মতো সুন্দরী। আর সুন্দরী পাঠিকা! ইনি আয়নায় আপনার প্রতিবিম্বের মতো রূপবতী।' এই টুকুতেই হয়ে যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, খুঁত একটু আছে।

খুঁত বলার কারণ হলো; প্রথমত, রমণীর শরীর মাঝারি গড়নের চেয়ে একটু লম্বা; দ্বিতীয়ত, ঠোঁট দুটো একটু চাপা; তৃতীয়ত, গায়ের রঙ ততটা ফর্সা নয়।

শরীর একটু লম্বা বটে, কিন্তু বেখাপ্পা নয় মোটেই। হাত-পাগুলো সুডৌল, সুগোল, বর্ষাকালের বিটপীলতার মতো পরিপূর্ণ, টলমলে। গায়ের রঙ ততটা ফর্সা নয় ঠিক, তবে খুব একটা কমও নয়। উজ্জ্বল শ্যাম বললেও বোধহয় একটু কম বলা হয়।

চোখ জোড়া বিশাল না হলেও অত্যন্ত সুন্দর, উজ্জ্বল। ভুরু দুটি বাঁকানো ধনুকের মতো। সে চোখের দৃষ্টি স্থির, অথচ মর্মভেদী। দৃষ্টি দিয়েই কারো অন্তর পর্যন্ত যেন দেখে নিতে পারে এই নারী। চেহারায় বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট।

সাতাশ বছর বয়েস মেয়েটির—ভাদ্র মাসের ভরা নদী। ভাদ্রমাসের নদীর মতো টলমল করছে ওর রূপ যৌবন—উছলে পড়ছে যেন। নিমেষহীন চোখে দেখছে নবকুমার।

'আপনি কি দেখছেন?' নবকুমারের অপলক চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো মেয়েটা। 'আমার রূপ?'

অপ্রতিভ হয়ে মুখ নামিয়ে নিলো নবকুমার। জবাব দিতে পারলো না কোনো। ওকে নিরুত্তর দেখে হাসলো তরুণী।

'মেয়েমানুষ দেখেননি কখনো?' কৌতুক ওর গলায়। 'নাকি, আমাকে বড় বেশি সুন্দরী মনে করছেন?'

সোজাসুজি বললে মনে হতে পারতো, অপমান করার জন্যেই বলা হয়েছে কথাটা। কিন্তু যে হাসির সাথে বলা হলো তাতে সরল কৌতুক ছাড়া আর কিছু নেই। নবকুমার বুঝলো, বেশ মুখরা মেয়েটা। মুখরার জবাবে মুখরা না হলে মুশকিল আছে।

'মেয়েমানুষ দেখেছি,' বললো ও, 'কিন্তু এমন সুন্দরী দেখিনি।'

'একটাও না?' গর্ব মেয়েটার গলায়।

কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ে গেল নবকুমারের। 'একটাও না,

এমন অবশ্য বলতে পারি না।'

'তবু ভালো, তিনি কি আপনার গৃহিণী?'

'কেন? গৃহিণী কেন ভাবছেন?'

'বাঙালীরা নিজের বউকে সবচেয়ে সুন্দরী মনে করে।'

'আমি বাঙালী, আপনিও তো বাঙালীর মতো কথা বলছেন, আপনি তাহলে কোন দেশী?'

নিজের পোশাক-আশাকের দিকে তাকালো যুবতী। 'অভাগিনী বাঙালী নয়, পশ্চিম প্রদেশের মেয়ে। মুসলমান।'

এতক্ষণে মেয়েটার পোশাক পরিচ্ছদ খেয়াল করলো নবকুমার। পশ্চিম প্রদেশের মুসলমানের মতো বটে। কিন্তু বাঙলা তো বাঙালীর মতোই বলছে।

মেয়েটা আবার বললো, 'আমার পরিচয় তো জানলেন, এবার আপনার পরিচয় দিয়ে চরিতার্থ করুন। যে বাড়িতে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী সে বাড়ি কোথায়?'

'আমার বাড়ি সপ্তগ্রাম।'

কোনো উত্তর দিলো না যুবতী বিদেশিনী। হঠাৎ মুখ নিচু করে প্রদীপ উজ্জ্বল করতে লাগলো। একটু পরে মুখ না তুলেই বললো, 'দাসীর নাম মতি। আপনার নাম কি জানতে পারি না?'

'নবকুমার শর্ম্মা।'

প্রদীপ নিভে গেল।

তিন

সুন্দরী সন্দর্শনে

চটিওয়ালাকে ডেকে আরেকটা প্রদীপ জ্বেলে আনতে বললো নবকুমার। নতুন আলো আসার আগে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো ও।

প্রদীপ আনার একটু পরে ভৃত্যবেশী এক মুসলমান এসে হাজির হলো। তাকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠলো বিদেশিনী।

'সে কি!' বললো সে, 'এত দেরি হলো কেন তোমাদের? আর সবাই কোথায়?'

'বাহকরা সব এমন জোরে ছুটেছিলো, ওদের সাথে তাল রাখতে পারিনি আমরা। পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। পরে ভাঙা পাল্কী দেখে আর আপনাকে না দেখে ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল। কেউ কেউ ঐ জায়গায়ই রয়েছে, দু'একজন আপনার খোঁজে অন্যান্য দিকে গেছে, আমি এদিকে এসেছি।'

'যাও ওদের নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি।'

সালাম করে চলে গেল ভৃত্য। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো বিদেশিনী নিজের ভেতর ডুবে গেছে সে। ঘরে আর কেউ যে আছে তা যেন মনে নেই।

বিদায় চাইলো নবকুমার। ঘুম ভেঙে উঠলো যেন মতি। জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বললো, 'আপনি কোথায় থাকবেন?'

'এই পাশের ঘরে।'

'ওই ঘরের সামনে একটা পাল্কী দেখলাম। আপনার সঙ্গে কেউ আছে নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার স্ত্রী।'

এতক্ষণ পরে আবার ব্যঙ্গ করার সুযোগ পেলো মতিবিবি। 'তিনিই কি আপনার অদ্বিতীয়া রূপসী?'

'দেখলে বুঝতে পারবেন।'

'দেখা কি আর পাবো?'

একটু ভাবলো নবকুমার। 'না পাওয়ার কোনো কারণ নেই।'

'তবে একটু অনুগ্রহ করুন। অদ্বিতীয়া রূপসীকে দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। আগ্রায় গিয়ে বলতে চাই···। কিন্তু না, এখন না। আপনি এখন যান। একটু পরে আপনাকে খবর দেবো আমি।'

চলে গেল নবকুমার।

একটু পরে অনেক লোকজন. দাসদাসী ও বাহক সিন্দুক ইত্যাদি নিয়ে হাজির হলো চটিতে। একটা পাল্কীও এলো। তাতে একজন দাসী। কিছুক্ষণের ভেতর নবকুমারের কাছে সংবাদ এলো, বিবি স্মরণ করেছেন।

মতিবিবির ঘরে এলো আবার ও। এখন একেবারে অন্য চেহারা বিদেশিনীর। আগের পোশাক বদলে মূল্যবান মণিমুক্তা খচিত কারুকাজ করা কাপড় পরেছে। নিরলঙ্কার দেহ অলঙ্কারে সাজিয়েছে। যেখানে যা ধরে—চুলে, খোঁপায়, কপালে, কানে, গলায়, বাহুতে, সব জায়গায় সোনার ভেতর থেকে হীরা, মুক্তা, পান্না প্রভৃতি রত্ন ঝলকাচ্ছে। অস্থির হলো নবকুমারের চোখ। রাতের আকাশের গায়ে নক্ষত্র যেমন জ্বলজ্বল করে মতিবিবির শরীরেও তেমন জ্বলজ্বল করছে অলঙ্কারগুলো। সৌন্দর্য অনেকগুণ বেড়ে গেছে তার।

'চলুন,' বললো মতিবিবি, 'আপনার স্ত্রীর সাথে পরিচিত হয়ে আসি।'

'সেজন্যে অলঙ্কার পরবার দরকার ছিলো না,' বললো নবকুমার। 'আমার স্ত্রীর কোনো গহনা নেই।'

'গহনাগুলো, ধরে নিন, দেখানোর জন্যে পরেছি। গহনা থাকলে মেয়েরা তা না দেখিয়ে বাঁচে না। এখন, চলুন।'

মতিবিবিকে সঙ্গে নিয়ে চললো নবকুমার। পাল্কীতে করে যে দাসী এসেছিলো সে-ও চললো। তার নাম পেষমন্।

ঘরের ভেজা ভেজা মাটিতে একা বসে আছে কপালকুণ্ডলা। মিটমিটে একটা প্রদীপ জ্বলছে শুধু। মাথার এলো চুলগুলো ওর পেছন দিকটা অন্ধকার করে রেখেছে। মানুষের শব্দে মুখ তুলে তাকালো সে।

প্রথমবার দেখেই ঠোঁটের পাশে আর চোখের কোণের মৃদু হাসির ঝিলিক দেখা দিলো মতিবিবির। ভালো করে দেখার জন্যে প্রদীপটা তুলে কপালকুণ্ডলার

মুখের কাছে আনলো। হাসির ঝিলিক মিলিয়ে গেল ওর ঠোঁটের কোনা থেকে। অপলক চোখে দেখতে লাগলো। কারো মুখেই কথা নেই। মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা বিস্মিতা।

একটু পরে হঠাৎ শরীর থেকে অলঙ্কারগুলো খুলতে শুরু করলো মতি। সবগুলো খোলা হয়ে গেলে একে একে পরিয়ে দিতে লাগলো কপালকুণ্ডলাকে। কিছু বললো না কপালকুণ্ডলা।

'ও কি হচ্ছে?' ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলো নবকুমার।

জবাব দিলো না মতি। অলঙ্কার পরানো শেষ করে নবকুমারের দিকে ফিরলো সে। 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন। এ ফুল রাজার বাগানেও ফোটে না। কিন্তু আমার দুঃখ, রাজধানীতে এ সৌন্দর্য দেখাতে পারলাম না। এসব অলঙ্কার এই শরীরেরই উপযুক্ত। তাই পরিয়ে দিলাম। আপনিও কখনো কখনো পরিয়ে এই মুখরা বিদেশিনীকে মনে করবেন।'

চমৎকৃত হলো নবকুমার। 'সে কি! এ যে অনেক দামী জিনিস। আমি এ সব নেবো কেন?'

'ঈশ্বরের কৃপায় আমার আরো আছে। আমি নিরাভরণা হবো না। একে পরিয়ে যদি আমার আনন্দ হয়, আপনি বাধা দেবেন কেন?'

নবকুমারকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দাসীর সঙ্গে চলে গেল মতিবিবি।

নির্জনে এসে পেষমন্ জিজ্ঞেস করলো, 'বিবিজান! কে লোকটা?'

মতিবিবি উত্তর দিলো 'মেরা শৌহর।'

চার

শিবিকারোহণে

অলঙ্কারের কি দশা হলো?

অলঙ্কার রাখার জন্যে রূপার কাজ করা একটা হাতির দাঁতের কৌটা পাঠিয়ে দিলো মতিবিবি। ডাকাতরা তার জিনিসপত্রের অল্পই নিতে পেরেছিলো। কাছে যা ছিলো তা ছাড়া কিছু পায়নি।

দু'একখানা গহনা কপালকুণ্ডলার শরীরে রেখে বেশিরভাগই কৌটায় তুলে রাখলো নবকুমার। পরদিন সকালে মতিবিবি বর্ধমানের দিকে, আর নবকুমার সস্ত্রীক সপ্তগ্রামের দিকে রওনা হয়ে গেল। কপালকুণ্ডলাকে পাল্কীতে তুলে দিয়ে গহনার কৌটাটা তার সঙ্গে দিয়ে দিলো নবকুমার। আগের দিনের মতো হেঁটে চললো নিজে।

এদিনও বাহকেরা সহজেই নবকুমারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। পাল্কীর দরজা খুলে চারদিক দেখতে দেখতে যাচ্ছে কপালকুণ্ডলা। এক ভিক্ষুক তাকে দেখতে পেয়ে ভিক্ষা চাইতে চাইতে পাশে পাশে চললো।

কপালকুণ্ডলা বললো, 'আমার তো কিছু নেই, তোমাকে কি দেব?'
ওর গায়ে এখনো যে দু'একটা গহনা আছে আঙুল দিয়ে সেগুলো দেখালো ভিক্ষুক। 'সে কি মা! তোমার গায়ে হীরা মুক্তা—তোমার কিছু নেই!'
'গহনা পেলে তুমি সন্তুষ্ট হও?'
বিস্মিত হলো ভিক্ষুক। কিন্তু বলতে ছাড়লো না, 'হই বই কি।'
বিন্দুমাত্র ভাবনা চিন্তা না করে কৌটাসমেত গহনাগুলো ভিক্ষুকের হাতে দিয়ে দিলো কপালকুণ্ডলা। শরীরেরগুলোও খুলে দিলো। দাস দাসী কিছুই জানতে পারলো না।
কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল হয়ে রইলো ভিক্ষুক। তারপরই একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো গহনা নিয়ে।
কপালকুণ্ডলা ভাবলো, 'ভিক্ষুক পালালো কেন?'

পাঁচ

স্বদেশে

কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে নবকুমার। বাবা বেঁচে নেই ওর। বাড়িতে কেবল বিধবা মা আর দুই বোন। বড় বোনও বিধবা। ছোটজন শ্যামাসুন্দরী সধবা হয়েও বিধবা, কারণ সে কুলীনের স্ত্রী।
বাড়ির অবস্থা অন্যরকম হলে কি হতো বলা যায় না। তবে এই পরিস্থিতিতে অজ্ঞাত কুলশীল এক তপস্বিনীকে বিয়ে করে নিয়ে আসায় কোনো রকম অসুবিধার মুখোমুখি হতে হলো না নবকুমারকে। ওর ফিরে আসার আশা ছেড়ে দিয়েছিলো সবাই। সহযাত্রীরা ফিরে এসে রটিয়ে দিয়েছিলো যে, নবকুমারকে বাঘে খেয়েছে। পাঠক হয়তো ভাববেন, তাঁরা যা ভেবেছিলেন তা-ই বলেছিলেন। আসলে ঘটনা অন্যরকম। যাত্রীদের অনেকে নিশ্চিত করে বলেছিলেন যে, নিজ চোখে তাঁরা নবকুমারকে বাঘের মুখে পড়তে দেখেছিলেন। বাঘটা কত বড় তা নিয়েও তর্ক হয়েছিলো কারো কারো ভেতর। কেউ বলেছিলেন, 'বাঘটা আট হাত হবে…।' কেউ বলেন, 'না, প্রায় চোদ্দ হাত।' আমাদের সেই বৃদ্ধ যাত্রী বললেন, 'যা হোক, আমি বাবা বড় বাঁচা বেঁচে গেছি! বাঘটা প্রথমে আমাকেই তাড়া করেছিলো, আমি পালালাম। নবকুমার তত সাহসী নয়, পালাতে পারলো না।'
এই সব গল্প কথা যখন নবকুমারের মায়ের কানে ওঠে, তখন বাড়িতে এমন কান্নার রোল পড়ে যে, কয়েক দিনে তা থামেনি। একমাত্র ছেলের মৃত্যু সংবাদে ওর মা একেবারে মুষড়ে পড়েন। এমন সময় নবকুমার যখন সস্ত্রীক বাড়ি এলো, তখন তাকে কে জিজ্ঞেস করে, তোমার বউ কোন্ জাতের বা কার মেয়ে? আনন্দে আত্মহারা হলো সবাই। মহাসমাদরে বধূবরণ করলেন নবকুমারের মা।
নবকুমার যখন দেখলো, বাড়িতে সাদরে গৃহীত হয়েছে কপালকুণ্ডলা তখন তার হৃদয় উছলে উঠলো আনন্দে। অনাদরের ভয়ে কপালকুণ্ডলাকে লাভ করেও বিন্দুমাত্র আনন্দ বা প্রেমের ভাব প্রকাশ করেনি ও—যদিও ওর মন সবসময়

কপালকুণ্ডলার চিন্তাতেই আচ্ছন্ন হয়ে ছিলো। অনাদর হতে পারে, এই আশঙ্কায়ই ও কপালকুণ্ডলাকে বিয়ে করার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হতে পারেনি। কিন্তু যে মুহূর্তে সব আশঙ্কা দূর হয়ে গেল তখনই বন্যার তোড়ের মতো প্রেমের সাগর উছলে উঠলো ওর মনে।

ছয়

অবরোধে

এক কালে খুবই সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল সপ্তগ্রাম। জাভা থেকে শুরু করে রোম পর্যন্ত সব দেশের বণিকেরা বাণিজ্যের জন্যে এই নগরে মিলিত হতো। কিন্তু বাঙলা দশম-একাদশ শতাব্দীর দিকে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির অনেকখানিই ম্লান হয়ে আসে। এর প্রধান কারণ হলো, নগরের পাশ দিয়ে যে নদীটা বয়ে চলেছে তার সরু হয়ে আসা। আর কয়েক বছরের ভেতর হয়তো পুরো মজে যাবে নদীটা। বড় বড় জলযানগুলো এখন আর নগর পর্যন্ত আসতে পারে না। ফলে বাণিজ্যের পরিমাণ কমে গেছে অনেক । এই কারণে সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধিও এখন পড়তির দিকে। নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে হুগলিতে। বিদেশী বণিকদের ভেতর পর্তুগীজরাই এখন প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে। যা হোক, সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি এবং গুরুত্ব অনেক কমে গেছে বটে, কিন্তু একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। এখন পর্যন্ত যা আছে তা ভাঙিয়েই আরো কয়েক যুগ চলতে পারবে সপ্তগ্রাম। এখনো ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদের বাস এখানে। তবে নগরীর অনেক অংশই এখন শ্রীহীন, বসতিহীন হয়ে পল্লীগ্রামের চেহারা নিয়েছে।

এই সপ্তগ্রামের এক নির্জন কোনায় নবকুমারের বাস। আশপাশে লোকবসতি বিশেষ নেই। রাজপথগুলো লতাগুল্মে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ওর বাড়ির পেছনেই বিস্তৃত ঘন একটা বন। বাড়ির সামনে প্রায় আধ ক্রোশ দূর দিয়ে একটা খাল বয়ে যাচ্ছে। ছোট একটা প্রান্তর ঘুরে পেছনের বনে ঢুকেছে খালটা।

নবকুমারের বাড়িটা ছোট, কিন্তু ইটের তৈরি। দোতলা। দেশকাল বিবেচনা করলে সামান্য বলা যায় না বাড়িটাকে।

এই বাড়ির ছাদে দুই তরুণী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে চার পাশের প্রকৃতি। সন্ধ্যা হয় হয়। চারদিকের দৃশ্য অবশ্যই মুগ্ধ হওয়ার মতো। বাড়ির একদিকে নিবিড় বন, অসংখ্য পাখি কলরব করছে সেখানে। অন্যদিকে সরু খাল, রুপোর সুতার মতো এঁকেবেঁকে পড়ে রয়েছে। দূরে, একদিকে মহানগরের অসংখ্য সৌধশ্রেণী। অন্যদিকে, অনেক দূরে অসংখ্য নৌকার অলঙ্কার পরা ভাগীরথী। সন্ধ্যার আঁধার ক্রমেই গাঢ় হয়ে নেমে আসছে তার বুকে।

ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা তরুণী দুজন আর কেউ নয়, একজন কপালকুণ্ডলা অন্যজন নবকুমারের ছোট বোন শ্যামাসুন্দরী। শ্যামাসুন্দরী ভাইয়ের স্ত্রীকে কখনো 'বউ', কখনো আদর করে 'বোন', কখনো 'মৃণো' বলে ডাকছে। কপালকুণ্ডলা

নামটা বিকট বলে, বাড়ির সবাই তার নতুন নামকরণ করেছে মৃণ্ময়ী। এ কারণেই 'মৃণো' সম্বোধন।

ছেলেবেলায় শেখা একটা কবিতা আওড়াচ্ছে শ্যামাসুন্দরী।

'তুই কি লো একা তপস্বিনী থাকবি?' কবিতা শেষ করে জিজ্ঞেস করলো সে।

'কেন? তপস্যা আবার করছি কোথায়?' মৃণ্ময়ীর জবাব।

ওর ঘন লম্বা চুলগুলো দু'হাতে গোছা পাকিয়ে তুলে নিলো শ্যামাসুন্দরী। 'তোমার এই চুলের রাশি কি বাঁধবে না?'

মৃদু হেসে শ্যামাসুন্দরীর হাত থেকে চুলগুলো টেনে নিলো মৃণ্ময়ী, কিছু বললো না।

'ভালো, আমার সাধটা একটু পুরাও,' আবার বললো শ্যামাসুন্দরী। 'একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মতো সাজো। কতদিন যোগিনী থাকবে?'

'তোমার ভাইয়ের সাথে দেখা হওয়ার আগে তো আমি যোগিনীই ছিলাম।'

'এখন থাকতে পারবে না।'

'কেন?'

'কেন, দেখবে? যোগ ভাঙবো। পরশ পাথর কাকে বলে জানো?'

মৃণ্ময়ী বললো. 'না।'

'পরশপাথরের স্পর্শে রাঙও সোনা হয়।'

'তাতে কি?'

'মেয়েমানুষেরও পরশপাথর আছে।'

'সে কি?'

'পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হয়ে যায়। তুই সেই পাথর ছুঁয়েছিস। দেখবি, তোকেও চুল বাঁধতে হবে, ভালো কাপড় পরতে হবে, খোপায় ফুল দিতে হবে, কানে দুল পরতে হবে, কোলে আসবে সোনার পুতুল ছেলে। দেখি ভালো লাগে কি না লাগে।'

চুপ করে রইলো মৃণ্ময়ী। তারপর বললো, 'বেশ, বুঝলাম। পরশপাথর ছুঁয়েছি, সোনা হলাম। চুল বাঁধলাম, গহনা পরলাম, ভালো কাপড় পরলাম, সোনার পুতুল পর্যন্ত হলো। কিন্তু তাতেই বা কি সুখ?'

'বলো দেখি, ফুলটা ফুটলে কি সুখ?'

'লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?'

গম্ভীর হলো শ্যামাসুন্দরীর মুখ। বিস্ফারিত চোখ দুটো সকালের বাতাসে দুলে ওঠা নীল পদ্মের মতো দুললো একটু। 'ফুলের কি? তা তো বলতে পারি না। কখনো ফুল হয়ে ফুটিনি। কিন্তু যদি তোমার মতো কলি হতাম, ফুটে সুখ হতো।'

নীরব মৃণ্ময়ী। শ্যামাসুন্দরী আবার বললো, 'আচ্ছা, তাই যদি না হলো, তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কিসে?'

একটু ভাবলো মৃণ্ময়ী। বললো, 'জানি না বোধহয়, সমুদ্রতীরের সেই বনে বনে বেড়াতে পারলে আমার সুখ হতো।'

আশ্চর্য হলো শ্যামাসুন্দরী। ওদের যত্ন, আদর একটুও মূল্য পায়নি মৃণ্ময়ীর

কাছে! একটু ক্ষুব্ধ হলো ও। কিছুটা রুষ্টও। বললো, 'এখন তাহলে উপায়? ফিরে যাবে?'

'উপায় নেই। ফিরে যাওয়াও যাবে না।'

'তাহলে কি করবে?'

'অধিকারী বলতেন, *যথা নিযুক্তোহাস্মি তথা করোমি* ।'

হেসে ফেললো শ্যামাসুন্দরী। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললো, 'যে আজ্ঞা, ভট্টাচার্য মহাশয়! তা এখন বলুন কি—?'

'যা বিধাতা করাবেন, তাই করবো,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো মৃণ্ময়ী। 'যা কপালে আছে তাই ঘটবে।'

'কেন, কপালে আবার কি আছে? কপালে সুখ আছে। তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন?'

'শোনো, যেদিন স্বামীর সাথে রওনা হয়ে আসি, সেদিন আসার আগে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গিয়েছিলাম। মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়ে আমি কোনো কাজ করতাম না। কাজ যদি শুভ হতো, তাহলে মা ত্রিপত্র ধারণ করতেন। যদি অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা থাকতো, ত্রিপত্র পড়ে যেতো। অপরিচিত লোকের সাথে অচেনা দেশে আসতে ভয় হচ্ছিলো। ভালো মন্দ জানতে মার কাছে গেলাম। মা ত্রিপত্র ধারণ করলেন না। সুতরাং কপালে কি আছে জানি না।'

মৃণ্ময়ী নীরব হলো। শিউরে উঠলো শ্যামাসুন্দরী।'

তৃতীয় খণ্ড

এক

ভূতপূর্বে

নবকুমার যখন কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে চটি থেকে রওনা হয়, তখন মতিবিবিও অন্য পথে বর্ধমানের দিকে রওনা হয়ে আসে। বর্ধমানের পথে চলতে থাকুক মতিবিবি এই সুযোগে আমরা তার পূর্ব জীবনের কিছু কথা জেনে নিই। নানা দোষে কলুষিত মতির চরিত্র। মহৎ গুণও যে নেই তা নয়। এমন চরিত্রের বিস্তারিত বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হবেন না পাঠক।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর ওর বাবা ওর হিন্দু নাম বদলে রাখলেন লুৎফ্-উন্নিসা। মতিবিবি কখনোই ওর নাম নয়। তবে কখনো কখনো ছদ্মবেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করার সময় এ নামে পরিচয় দেয় ও।

ঢাকায় এসে রাজকাজে নিযুক্ত হলেন লুৎফ্-উন্নিসার বাবা। কিন্তু স্বদেশের অনেক লোক বাস করে সেখানে। ফলে ঢাকায়ও অনেকটা সমাজচ্যুত হয়ে রইলেন তিনি। দেশীয় সমাজে সমাজচ্যুত হয়ে থাকতে ভালো লাগলো না তাঁর। কিছুদিন সুবাদারের অধীনে কাজ করে বেশ খানিকটা প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করলেন। তারপর ঢাকার নামকরা ওমরাহদের কাছ থেকে সুপারিশপত্র সংগ্রহ করে সপরিবারে চলে এলেন আগ্রায়। ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা তখন সম্রাট আকবরের হাতে।

আকবর শাহ্‌র কাছে কারো গুণের কথা বেশি দিন অজানা থাকে না। লুৎফ্-উন্নিসার বাবার গুণের খবরও লুকানো রইলো না। শিগগিরই লুৎফ্-উন্নিসার বাবা উচ্চপদস্থ হয়ে আগ্রার ওমরাহদের একজন হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন।

এদিকে বয়স বাড়ছে লুৎফ্-উন্নিসার। আগ্রায় এসে ফার্সি, সংস্কৃত, নাচ, গান এসব বিদ্যায় সুশিক্ষিতা হলো সে। এবং অল্প দিনের মধ্যে রাজধানীর অসংখ্য রূপবতী গুণবতীদের অন্যতম হিসেবে পরিচিতি লাভ করলো। দুর্ভাগ্যবশত, নাচ, গান এবং অন্যান্য বিষয়ে ওর যতটা শিক্ষা হলো, ধর্ম সম্পর্কে তার কিছুই হলো না।

কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিলো লুৎফ্-উন্নিসা। এর পর থেকেই প্রকাশ পেতে লাগলো তার চরিত্রের আসল দিকগুলো। অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক ব্যাপারগুলোতেই তার আকর্ষণ বেশি। ইন্দ্রিয়কে বশে রাখার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই, ইচ্ছেও নেই। ভালো-মন্দের কোনো বোধ নেই। এ কাজ ভালো, এ কাজ মন্দ, এমন বিচার করে কোনো কাজ ও করে না। যা ভালো লাগে তা-ই করে। যখন ভালো কাজ করে মন সুখ পায় তখন ভালো কাজ করে। যখন খারাপ কাজ করতে ইচ্ছে করে তখন খারাপ কাজ করে। যৌবনের মনোবৃত্তি অদম্য হলে চরিত্রে যেসব দোষ দেখা দেয় লুৎফ্-উন্নিসারও তা হলো। তার আগের স্বামী বেঁচে আছে,—ওমরাহরা কেউ তাকে বিয়ে করতে রাজি হলো না। ও-ও বিয়ের ব্যাপারে

খুব একটা উৎসাহী বা আগ্রহী হলো না। মনে মনে ভাবলো, ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানো ভ্রমরের পাখা কেন কাটবে? প্রথমে কানাকানি, শেষে কুৎসিত কলঙ্ক রটলো। ওর বাবা বিরক্ত হয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন ওকে।

গোপনে যাদেরকে কৃপা বিতরণ করে লুৎফ্-উন্নিসা, তাদের একজন যুবরাজ সেলিম। একজন উচ্চ পদস্থ ওমরাহের কুলে কলঙ্ক দিলে পিতা সম্রাট আকবরের কোপ দৃষ্টিতে পড়তে হতে পারে, এই ভয়ে এতদিন লুৎফ্-উন্নিসাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে তুলতে পারেননি সেলিম। এবার সুযোগ পেলেন। রাজপুত রাজা মানসিংহের বোন তাঁর প্রধান স্ত্রী। লুৎফ্-উন্নিসাকে তাঁর প্রধান সহচরী করলেন তিনি। লুৎফ্-উন্নিসা উপরে উপরে বেগমের সখী, ভেতরে ভেতরে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী হলো।

লুৎফ্-উন্নিসার মতো বুদ্ধিমতী মহিলা যে অল্প দিনেই রাজকুমারকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলবে তা সহজেই বোঝা যায়। সেলিমের ওপর তার প্রভুত্ব এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো যে, তার স্থির বিশ্বাস হলো, উপযুক্ত সময়ে সে ভারত সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হবে। শুধু যে লুৎফ্-উন্নিসারই এমন ধারণা হলো তা নয়, রাজপুরীর সবার কাছেই ব্যাপারটা সম্ভব মনে হলো।

এরকম আশার স্বপ্নে জীবন কেটে যাচ্ছে লুৎফ্-উন্নিসার, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হলো।

বাদশাহ আকবরের কোষাধ্যক্ষ (আকতিমাদ-উদ্দৌলা) খাজা আয়াসের মেয়ে মেহের-উন্নিসা মুসলমানদের ভেতর সেরা সুন্দরী। একদিন রাজকুমার সেলিম ও অন্য কয়েকজন আমীর ওমরাহকে দাওয়াত করে বাড়িতে আনলেন কোষাধ্যক্ষ। মেহের-উন্নিসার সাথে সেলিমের দেখা হলো সেদিন। এবং সেদিনই মেহের-উন্নিসার কাছে হৃদয় রেখে গেলেন যুবরাজ। তারপর কি ঘটলো তা ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন।

আগে থেকেই শের আফগান নামের এক মহাবিক্রমশালী ওমরাহের সাথে কোষাধ্যক্ষের মেয়ের সম্বন্ধ হয়ে ছিলো। প্রেমে অন্ধ হয়ে সে সম্বন্ধ ভেঙে দেয়ার জন্যে পিতার কাছে প্রার্থনা জানালেন সেলিম। কিন্তু বাদশাহ তার প্রার্থনায় কান তো দিলেন-ই না বরং বেশ খানিকটা বকাঝকা করলেন। সুতরাং আপাতত নিরস্ত হতে হলো সেলিমকে। শের আফগানের সাথে বিয়ে হয়ে গেল মেহের-উন্নিসার।

আপাতত নিরস্ত হলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়লেন না যুবরাজ।

সেলিমের মানসিক প্রবণতাগুলো লুৎফ্-উন্নিসার নখদর্পণে। ও ভালো করেই জানে, যদি হাজারটা প্রাণও থাকে, তবু নিস্তার নেই শের আফগানের। আকবর শাহ্ মারা গেলেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে তার। মেহের-উন্নিসাকে বিয়ে করবেনই যুবরাজ। সিংহাসনের আশা ছেড়ে দিলো লুৎফ্-উন্নিসা।

মোগল সম্রাট আকবরের পরমায়ু শেষ হয়ে এলো। যে প্রচণ্ড সূর্যের প্রভায় তুরস্ক থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিশাল এলাকা আলোকিত হয়ে ছিলো, সে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হলো। এ সময় নিজের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখার আশায় দুঃসাহসিক এক সংকল্প করলো লুৎফ্-উন্নিসা।

রাজপুতপতি রাজা মানসিংহের বোন সেলিমের প্রধান বেগম। খসরু তাঁর ছেলে। একদিন সম্রাটের অসুস্থতা নিয়ে বেগমের সাথে আলাপ হচ্ছিলো লুৎফ্-উন্নিসার। রাজপুত কন্যা এবার রাণী হবেন, এই কথার প্রসঙ্গে তাঁকে অভিনন্দন জানালো সে। জবাবে খসরুর মা বললেন, 'রাণী হতে পারলে মানুষ হিসেবে জন্ম সার্থক, সন্দেহ নেই। কিন্তু যিনি বাদশাহর মা, তিনিই সবচেয়ে উপরে।'

জবাবটা শোনামাত্র আচমকা একটা বুদ্ধি খেলে গেল লুৎফ্-উন্নিসার মাথায়। আগে কোনো দিন স্বপ্নেও সম্ভাবনাটার কথা মনে আসেনি ওর।

'তা-ই হোক না কেন?' বললো ও। 'সে ও তো আপনি চাইলেই হয়।'

'মানে?'

'যুবরাজপুত্র খসরুকে সিংহাসন দান করুন।'

কোনো জবাব দিলেন না বেগম। সেদিন আর একবারও এ প্রসঙ্গ উঠলো না। কিন্তু কেউই ভুললেন না কথাটা। স্বামীর বদলে ছেলে সিংহাসনে আরোহণ করলে আপত্তি নেই বেগমের। মেহের-উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ লুৎফ্-উন্নিসার পক্ষে যেমন অসহ্য, বেগমেরও তেমন। কোথাকার এক তুর্কমান মেয়ের অধীন হয়ে থাকা, ভালো লাগবে কেন মানসিংহের বোনের? লুৎফ্-উন্নিসার দিক থেকেও গূঢ় একটা উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং অন্য দিন আবার উঠলো এ প্রসঙ্গ। একমত হলো দুজনে।

সেলিমকে বাদ দিয়ে খসরুকে সিংহাসনে বসানো অসম্ভব কিছু না, যুক্তিতর্ক দিয়ে সহজেই কথাটা বেগমকে বোঝাতে পারলো লুৎফ্-উন্নিসা।

'মোগলের সাম্রাজ্য রাজপুতের শক্তিতেই টিকে আছে,' বললো সে। 'সেই রাজপুত জাতির চূড়ামণি রাজা মানসিংহ, তিনি আপনার ভাই, খসরুর মামা। আর প্রধান রাজমন্ত্রী খাঁ আজিম, তিনি খসরুর শ্বশুর। এঁরা দুজনে উদ্যোগ নিলে, কে এঁদের বিপক্ষে যাবে? আর কার শক্তিতেই বা যুবরাজ সিংহাসন গ্রহণ করবেন? রাজা মানসিংহকে এ কাজে রাজি করাবেন আপনি। খাঁ আজিম ও অন্যান্য মুসলমান ওমরাহদের রাজি করানোর ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনার আশীর্বাদে সফল হবো আমি। কিন্তু একটা ভয়, সিংহাসনে আরোহণ করেই এই দুশ্চারিণীকে বাড়ির বের করে দেবেন না তো খসরু?'

সহচরীর ইচ্ছে বুঝতে অসুবিধা হলো না বেগমের। হেসে বললেন, 'তুমি আগ্রার যে ওমরাহের গৃহিণী হতে চাইবে সে-ই তোমায় বিয়ে করবে। পাঁচ হাজারি মন্সবদার হবেন তোমার স্বামী।'

সন্তুষ্ট হলো লুৎফ্-উন্নিসা। এটাই তার উদ্দেশ্য ছিলো। রাজপুরিতে সামান্য পুরাঙ্গনা হয়েই যদি থাকতে হলো, তবে ফুলে ফুলে মধু খাওয়া ভ্রমরের পাখা কেটে কি লাভ হলো? স্বাধীনতাই যদি ছাড়তে হলো, তো ছেলেবেলার সখী মেহের-উন্নিসার দাসী হয়ে কি সুখ? তার চেয়ে কোনো উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সর্বময়ী ঘরণী হওয়া অনেক গৌরবের—অনেক সম্মানের।

শুধু এই লোভেই এ-ষড়যন্ত্র পাকানোর ফন্দি করলো না লুৎফ্-উন্নিসা। সেলিম যে তাকে উপেক্ষা করে মেহের-উন্নিসার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে, এর প্রতিশোধ

নেওয়াও তার উদ্দেশ্য।

খাঁ আজিম এবং আগ্রা-দিল্লীর অন্য নামকরা ওমরাহরা লুৎফ্-উন্নিসার বিলক্ষণ বাধ্য ছিলেন। তা ছাড়া, জামাইকে সিংহাসনে বসানোর সুযোগ পেলে ছাড়বেন কেন খাঁ আজিম? তিনি এবং অন্যান্য ওমরাহ সম্মত হলেন তার প্রস্তাবে।

'ধরো, কোনো দৈব দুর্বিপাকে আমরা সফল হতে পারলাম না,' লুৎফ্-উন্নিসাকে বললেন খাঁ আজিম, 'তোমার আর রক্ষা থাকবে না। সুতরাং প্রাণ বাঁচানোর একটা পথ রাখা ভালো।'

'আপনার পরামর্শ কি?'

'উড়িষ্যা ছাড়া আর কোনো জায়গা নেই পালানোর মতো। একমাত্র ঐ এলাকায়ই মোগলের শাসন তত দৃঢ় নয়। উড়িষ্যায় আমাদের যে বাহিনী আছে, সেটা হাতে রাখা দরকার। তোমার ভাই উড়িষ্যায় মন্সবদার। আমি কাল রটিয়ে দেব, যুদ্ধে আহত হয়েছেন তিনি। তাকে দেখবার ছল করে কালই উড়িষ্যায় রওনা হয়ে যাও তুমি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখানে কিছু ঠিকঠাক করে ফিরে আসবে।'

লুৎফ্-উন্নিসা মেনে নিলো এ পরামর্শ। উড়িষ্যায় কাজ সেরে সে যখন ফিরে আসছিলো তখন নবকুমার এবং পাঠকের সাথে তার দেখা হয়েছিলো।

দুই

পথান্তরে

নবকুমারকে বিদায় করে মতিবিবি ওরফে লুৎফ্-উন্নিসা বর্ধমানের দিকে রওনা হলো। রওনা হলো কিন্তু দিনে দিনে পৌঁছুতে পারলো না বর্ধমান পর্যন্ত। দিন শেষে অন্য একটা চটিতে আশ্রয় নিলো সে।

সন্ধ্যার সময় পেষমনের সাথে আলাপ করছে মতি। 'পেষমন্! আমার স্বামীকে কেমন দেখলে?' জিজ্ঞেস করলো সে।

পেষমন্ একটু বিস্মিত হলো। 'কেমন আর দেখবো?'

'সুন্দর পুরুষ বটে কি না?'

নবকুমারের ওপর মনে মনে চটে ছিলো পেষমন্। কপালকুণ্ডলাকে যে অলঙ্কারগুলো দিয়েছিলো মতি, সেগুলোর ওপর বিশেষ লোভ ছিলো তার। ভেবেছিলো, একদিন চেয়ে নেবে। সেই আশা নির্মূল হয়েছে। তাই কপালকুণ্ডলা আর তার স্বামী, দুজনের ওপরই তার দারুণ বিরক্তি।

'গরিব ব্রাহ্মণ আবার সুন্দর কুৎসিত কি?' জবাব দিলো সে।

দাসীর মনের ভাব বুঝতে পেরে একটু হাসলো মতি। 'গরিব ব্রাহ্মণ যদি ওমরাহ হয়, তাহলে সুন্দর পুরুষ হবে কি না?'

'সে আবার কি? ব্রাহ্মণ আবার ওমরাহ হবে কিভাবে?'

'কেন, তুমি জানো না, বেগম স্বীকার করেছেন, খসরু বাদশাহ হলে আমার স্বামী ওমরাহ হবে?'

'তা তো জানি। কিন্তু আপনার আগের স্বামী ওমরাহ হবেন কেন?'
'তা ছাড়া আমার আর কোন্ স্বামী আছে?'
'যিনি নূতন হবেন।'
আবার হাসলো মতি। 'আমার মতো সতীর দুই স্বামী, বড় অন্যায় কথা—ও কে যায়?'
ব্যস্তভাবে উঠে দরজার কাছে গেল পেষমন্। যাকে দেখে মতি 'ও কে যায়?' বলে চিৎকার করে উঠেছে, তাকে চিনলো সে। আগ্রার খাঁ আজিমের লোক। মতির ডাক শুনে ব্যস্ত হয়েছে সে-ও। পেষমন্ ডেকে আনলো তাকে।
প্রথমে লুৎফ্-উন্নিসাকে সালাম জানালো লোকটা। তারপর পোশাকের ভেতর থেকে একটা চিঠি বের করে দিলো। বললো, 'চিঠি নিয়ে উড়িষ্যা যাচ্ছিলাম। জরুরি চিঠি।'
মোহর ভেঙে চিঠি খুললো মতি। পড়তে পড়তে মুখ কালো হয়ে উঠলো ওর।
চিঠির মর্ম—'আমাদের চেষ্টা বিফল হয়েছে। মৃত্যুর সময়ও আকবর শাহ নিজের বুদ্ধি দিয়ে পরাজিত করে গেছেন আমাদের। মারা গেছেন তিনি। কুমার সেলিম এখন জাহাঁগীর শাহ হয়েছেন। খসরুর জন্যে চিন্তা কোরো না। কেউ যেন তোমার শত্রুতা করতে না পারে সেজন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগ্রায় ফিরে এসো তুমি।'
আশা ভরসা সব শেষ হয়ে গেছে মতির। কিছু পুরস্কার দিয়ে দূতকে বিদায় করে দিলো ও। তারপর পেষমন্‌কে পড়ে শোনালো চিঠি।
'এখন উপায়?' জিজ্ঞেস করলো পেষমন্।
'কোনো উপায় নেই।'
একটু ভেবে পেষমন্ বললো, 'ভালো, ক্ষতিই বা কি? যেমন ছিলেন, তেমন থাকবেন। মোগল বাদশাহর পুরাঙ্গনা মাত্রই অন্য রাজ্যের রাণীর চেয়েও বড়।'
'তা আর হয় না, পেষমন্।' হাসলো মতি—করুণ হাসি। ঐ রাজপুরীতে আর থাকতে পারবো না। শিগগিরই মেহের-উন্নিসার সাথে বিয়ে হবে জাহাঁগীরের। ওকে আমি ছোটবেলা থেকেই ভালো করে জানি, একবার বেগম হতে পারলে ও-ই আসল বাদশাহ হবে, জাহাঁগীর থাকবে নামমাত্র বাদশাহ। আমি যে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের পথে বাধা হয়েছিলাম তা অজানা থাকবে না তার। তখন আমার দশা কি হবে?'
প্রায় কেঁদে ফেললো পেষমন্। 'তা হলে কি হবে?'
'একটা ভরসা আছে,' একটু চিন্তা করে বললো মতি। 'মেহের-উন্নিসা কি জাহাঁগীরকে চায়? ওর যা ব্যক্তিত্ব, তাতে যদি জাহাঁগীরের প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে শেষ পর্যন্ত ও স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তা হলে শত শের আফগান হত্যা করলেও জাহাঁগীর মেহের-উন্নিসাকে পাবে না। আর যদি মেহের-উন্নিসা সত্যিই জাহাঁগীরের অনুরাগিনী হয় তবে আর কোনো ভরসা নেই আমার।'
'মেহের-উন্নিসার মন কি করে জানবেন?'
'লুৎফ্-উন্নিসার অসাধ্য কি?' হাসলো মতি। 'মেহের-উন্নিসা আমার

বাল্যসখী—কালই বর্ধমানে গিয়ে ওর বাড়িতে দু'দিন থাকবো।'

'মেহের-উন্নিসা যদি বাদশাহ্র অনুরাগিনী হন, তাহলে কি করবেন?'

'বাবা বলতেন, *অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা*।' নিজের মনেই একটু হাসলো মতি। কুঁচকে উঠলো সুন্দর ঠোঁটজোড়া।

'হাসছেন কেন?' জিজ্ঞেস করলো পেষমন্।

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।'

'কি বুদ্ধি?'

মতি তা বললো না পেষমন্কে।

তিন

প্রতিযোগিনী গৃহে

বাঙলাদেশের সুবাদারের অধীনে কাজ করেন শের আফগান। বর্ধমানের কর্মাধ্যক্ষ তিনি।

বর্ধমানে পৌঁছে শের আফগানের বাড়িতে উঠলো মতিবিবি। অত্যন্ত সমাদরের সাথে তাকে অতিথি হিসেবে বরণ করলেন শের আফগান ও তাঁর স্ত্রী মেহের-উন্নিসা।

শের আফগান ও মেহের-উন্নিসা যখন আগ্রায় থাকতেন তখন তাঁদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলো মতি। মেহের-উন্নিসার সাথে তার বিশেষ ভাব ছিলো। পরে ঘটনাচক্রে দুজনেই দিল্লীর সাম্রাজ্যলাভের জন্যে প্রতিযোগী হয়েছিলো। অনেকদিন পর আবার দুজন এক জায়গায় হওয়ায় মেহের-উন্নিসা ভাবলো, 'ভারতবর্ষের কর্তৃত্ব বিধাতা কার অদৃষ্টে লিখেছেন তা বিধাতাই জানেন, আর জানেন সেলিম। এছাড়া আর কেউ যদি জানে তো সে এই লুৎফ্-উন্নিসা। চেষ্টা করে দেখি, জানা যায় কি না। ও কি কিছুই প্রকাশ করবে না?'

মতি বিবিরও একই চেষ্টা, 'দেখি চেষ্টা করে, মেহের-উন্নিসার মন জানা যায় কিনা।'

ভারতবর্ষের সেরা রূপসী এবং গুণবতী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে মেহের-উন্নিসা। সত্যি কথা বলতে কি, তার মতো মেয়ে পৃথিবীতে খুব কমই জন্ম নিয়েছে। সারা দুনিয়ার সেরা সুন্দরীদের একজন বলা যেতে পারে তাকে। বিদ্যা-বুদ্ধিতে খুব কম পুরুষই আছে তার চেয়ে বড়। নাচে-গানে অদ্বিতীয়া। কবিতা-রচনায় বা ছবি আঁকায়ও তার সমান নেই খুব বেশি লোক। তার সরস কথা তার সৌন্দর্যের চেয়েও মোহময়ী। এ সব গুণে মতিও খুব একটা খাটো নয় তার চেয়ে। আজ এই দুই চমৎকারিণী পরস্পরের মন জানতে উৎসুক হয়েছে।

খাস কামরায় বসে ছবি আঁকছে মেহের-উন্নিসা। পান চিবোতে চিবোতে তার পিঠের কাছে বসে দেখছে মতি।

'কেমন হচ্ছে ছবি?' জিজ্ঞেস করলো মেহের-উন্নিসা।

'তোমার ছবি যেমন হয় তেমনই হচ্ছে,' জবাব দিলো মতি। 'দুঃখের বিষয়, ছবি আঁকায় তোমার মতো নিপুণ আর কেউ নেই।'

'তাই যদি সত্যি হয় তো দুঃখের বিষয় কেন?'

'অন্য কেউ তোমার মতো ছবি আঁকতে পারলে তোমার এ মুখটা নিখুঁতভাবে ধরে রাখতে পারতো।'

'কবরের মাটি আরো নিখুঁতভাবে ধরে রাখবে এ মুখ।' গম্ভীর শোনালো মেহের-উন্নিসার গলা।

'বোন! আজ তোমার মন খারাপ মনে হচ্ছে? কেন বলবে?'

'মন খারাপ আবার কোথায়? কাল সকালে তুমি চলে যাবে সে কথাটাই ভুলতে পারছি না। আরো দু'দিন থেকে যাও না কেন?'

'দেখ, কার না ইচ্ছে করে একটু আনন্দে থাকতে? কত দিন পরে তোমার সাথে দেখা। কি আনন্দেই না কাটলো দুটো দিন। সাধ্য থাকলে আর দুদিন কি থাকতে পারতাম না? কিন্তু কি করবো বলো? আমি পরের অধীন। কি করে থাকবো?'

'আমার জন্যে আর আগের মতো ভালোবাসা নেই তোমার। থাকলে কোনো না কোনো ভাবে তুমি থেকে যেতে। আসতে যখন পেরেছ. থাকতে পারবে না. একটা কথা হলো?'

'সব কথাই তো বলেছি। আমার ভাই মোগল বাহিনীতে মন্সবদার—উড়িষ্যায় পাঠানদের সাথে যুদ্ধে আহত হয়েছেন তিনি। এই দুঃসংবাদ পেয়ে কোনোমতে বেগমের অনুমতি নিয়ে তাঁকে দেখতে এসেছিলাম। উড়িষ্যায় অনেক দেরি করে ফেলেছি, এখন আর দেরি করা ঠিক হবে না। তোমার সাথে অনেক দিন দেখা হয় না তাই একটু দেখে গেলাম।'

'কোন্ দিন তোমার পৌঁছুনোর কথা বেগমের কাছে?'

মতি বুঝলো মেহের-উন্নিসা ব্যঙ্গ করছে। মার্জিত অথচ মর্মভেদী ব্যঙ্গে মেহের-উন্নিসা যে রকম নিপুণ, মতি সে রকম নয়। তাই বলে অপ্রতিভ হবে এমনও না।

'দিন নিশ্চিত করে কি আর তিন মাসের পথ যাতায়াত করা সম্ভব?' জবাব দিলো সে। 'তবে অনেক দেরি করে ফেলেছি, আরো দেরি করলে ওদিকে আবার ক্ষেপে যাবে সবাই।'

ভুবনমোহিনী হাসি হাসলো মেহের-উন্নিসা। 'কার ক্ষেপে যাওয়ার আশঙ্কা করছো? যুবরাজের না তাঁর বেগমের?'

এবার একটু বিব্রত না হয়ে পারলো না মতি। 'লজ্জাহীনাকে কেন লজ্জা দিতে চাও? দু'জনেই অসন্তুষ্ট হতে পারেন।'

'কিন্তু জিজ্ঞেস করি,' গম্ভীর গলায় বললো মেহের-উন্নিসা, 'তুমি নিজে বেগম নাম ধারণ করছো না কেন? শুনেছিলাম যুবরাজ সেলিম তোমাকে বিয়ে করে খাস বেগম করবেন, তার কতদূর?'

'আমি তো এমনিতেই প্রায় পরাধীন। যেটুকু স্বাধীনতা আছে তা-ও বা নষ্ট করবো কেন? বেগমের সহচরী বলে ইচ্ছে হতেই উড়িষ্যায় আসতে পারলাম।

সেলিমের বেগম হলে কি পারতাম?'

'যে দিল্লীশ্বরের প্রধান বেগম হবে তার উড়িষ্যায় আসবার দরকারটাই বা কি?'

'দেখ, সেলিমের খাস বেগম হবো, এমন স্পর্ধা কখনো করি না। এই ভারতবর্ষের একমাত্র মেহের-উন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হওয়ার উপযুক্ত।'

মুখ নিচু করলো মেহের-উন্নিসা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'লুৎফ্-উন্নিসা, জানি না তুমি আমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে এ কথা বললে না আমার মন জানার জন্যে বললে। কিন্তু একটা অনুরোধ তোমার কাছে, আমি যে শের আফগানের স্ত্রী, আমি যে কায়মনোবাক্যে শের আফগানের দাসী, ভবিষ্যতে কথা বলার সময় তা দয়া করে ভুলবে না।'

বেহায়া মতি একটুও অপ্রতিভ হলো না এ কথায়, বরং আরো সুযোগ পেলো যেন। বললো, 'তুমি যে স্বামীঅন্তপ্রাণ, তা আমি ভালো করেই জানি। আর জানি বলেই ঠাট্টার ছলে তোমার সামনে একথা তুলতে সাহস পেয়েছি। সেলিম এখনো তোমার সৌন্দর্যের মোহ ভুলতে পারেননি, এই কথাটা তোমাকে জানানোই আমার উদ্দেশ্য। সাবধান থেকো।'

'এখন বুঝলাম। কিন্তু সাবধান থাকতে হবে কেন? ভয় কিসের?'

একটু ইতস্তত করার ভান করলো মতি। 'ভয় বিধবা হওয়ার।' বলেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেহের-উন্নিসার মুখের দিকে তাকালো ও। কিন্তু ভয় বা আনন্দের কোনো চিহ্ন সেখানে দেখতে পেলো না।

'বিধবা হওয়ার ভয়!' সদর্পে বললো মেহের-উন্নিসা। 'আত্মরক্ষায় অক্ষম নয় শের আফগান। তাছাড়া, আকবর বাদশাহর রাজ্যে কেউই বিনা দোষে অন্যের প্রাণ নষ্ট করে নিস্তার পাবে না। তাঁর পুত্র হলেও না।'

'কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু সাম্প্রতিক আগ্রার সংবাদ হলো, আকবর শাহ মারা গেছেন। সেলিম সিংহাসনে বসেছেন। দিল্লীশ্বরকে কে বাধা দেবে?'

আর কিছু শুনলো না মেহের-উন্নিসা। সারা শরীর শিউরে উঠলো তার। আবার মুখ নামিয়ে নিলো সে। দু'চোখের কোনায় টলমল করে উঠলো অশ্রু।

'কাঁদো কেন?' জিজ্ঞেস করলো মতি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো মেহের-উন্নিসা। 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?'

যা জানার তা জানা হয়ে গেছে মতির। 'তুমি আজও যুবরাজকে ভুলতে পারোনি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কাকে ভুলবো?' গাঢ়স্বরে বললো মেহের-উন্নিসা। 'নিজেকে ভুলতে পারবো, দুনিয়ার সবকিছু ভুলতে পারবো, তবু যুবরাজকে নয়।। কিন্তু শোনো, বোন, হঠাৎ করে মনের কপাট খুলে গেছে, তোমার সামনে বলে ফেলেছি এ কথা। কিন্তু আমার একটা মিনতি, এ কথা যেন আর কারো কানে না যায়।'

'ভালো তা-ই হবে। কিন্তু সেলিম যখন শুনবেন, আমি বর্ধমানে এসেছিলাম, তোমার এখানে উঠেছিলাম, তখন নিশ্চয়ই তিনি জিজ্ঞেস করবেন, "মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বললো?"—তখন আমি কি বলবো?'

একটু ভাবলো মেহের-উন্নিসা। 'বোলো, মেহের-উন্নিসা সারাজীবন তাঁর ধ্যান করবে।। প্রয়োজন হলে তাঁর জন্যে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেবে। কিন্তু কখনো নিজের সম্মান বিসর্জন দেবে না। স্বামী জীবিত থাকতে সে কখনো দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাবে না। আর যদি দিল্লীশ্বরের হাতে তার স্বামীর প্রাণ যায়, তবে স্বামীর হত্যাকারীর সাথে এজন্মে তাঁর মিলন হবে না।'

আর কিছু না বলে সেখান থেকে চলে গেল মেহের-উন্নিসা। পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলো মতিবিবি। শেষ পর্যন্ত তারই জয় হয়েছে। মেহের-উন্নিসার মনের ভাব জানতে পেরেছে ও, ওর মনের কথা কিছুই জানতে পারেনি মেহের-উন্নিসা। যে পরে নিজের বুদ্ধিবলে দিল্লীর বাদশাহরও বাদশাহ হয়েছিলো সে-ও মতির কাছে পরাজিত হলো। এর কারণ, মেহের-উন্নিসার হৃদয় যেখানে প্রেমে পূর্ণ, সেখানে মতির হৃদয় কেবলমাত্র স্বার্থপরায়ণ।

মানব হৃদয়ের বিচিত্র গতি ভালোই বোঝে মতিবিবি। মেহের-উন্নিসা একটু আগে যে কথাগুলো বলে গেল তা মনে মনে আলোচনা করে ও সিদ্ধান্ত করলো, মেহের-উন্নিসা সত্যি সত্যিই এখনো ভালোবাসে জাহাঁগীরকে। সুতরাং এখন যাই বলুক না কেন, পথ খুলে গেলে মনের গতি রোধ করতে পারবে না, একদিন সে দিল্লীর সম্রাজ্ঞী হবেই।

অর্থাৎ, মতির একমাত্র ভরসা নির্মূল হয়ে গেল। কিন্তু তাতে কি মতি দুঃখ পেলো একটুও? মোটেই না। বরং একটু যেন খুশিই হলো। কেন যে এমন অসম্ভব অনুভূতি হচ্ছে, মতি নিজেও তা বুঝতে পারলো না প্রথমে। আগ্রার পথে রওনা হলো ও। পথে কয়েক দিন গেল। সেই কয়েক দিনে বুঝতে পারলো, কেন খুশি লাগছে ওর।

চার

রাজনিকেতনে

আগ্রায় পৌঁছেছে মতি।

কয়েক দিন আগের মতি আর আজকের মতিতে আকাশ পাতাল পার্থক্য। এই কদিনে ওর মনটা একেবারে বদলে গেছে।

জাহাঁগীরের সাথে ওর সাক্ষাৎ হলো। আগের মতোই সাদরে গ্রহণ করলেন ওকে জাহাঁগীর। ওর ভাইয়ের খবর জিজ্ঞেস করলেন। পথে কষ্ট হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন। মেহের-উন্নিসাকে যা বলেছিলো মতি তা সত্যি হলো। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর বর্ধমানের কথা উঠলো।

জাহাঁগীর জিজ্ঞেস করলেন, 'মেহের-উন্নিসার কাছে দিন দুই ছিলে বলছো, আমার কথা কিছু বলেনি ও?'

অকপট হৃদয়ে মেহের-উন্নিসার অনুরাগের কথা বললো লুৎফ্-উন্নিসা। শুনে চুপ করে রইলেন বাদশাহ।

'জাহাঁপনা!' বললো লুৎফ্-উন্নিসা। 'দাসী শুভ সংবাদ দিয়েছে, এখনো কোনো পুরস্কারের আদেশ হয়নি।'

হাসলেন জাহাঁগীর। 'তোমার আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত, লুৎফ্-উন্নিসা!'

'জাহাঁপনা! দাসীর কি দোষ?'

'দিল্লীর বাদশাহকে তোমার গোলাম করে দিয়েছি, আরো পুরস্কার চাও?'

লুৎফ্-উন্নিসাও হাসলো এবার। 'মেয়েলোকের অনেক সাধ।'

'আবার কি সাধ হয়েছে?'

'আগে রাজ-আজ্ঞা হোক, দাসীর আবেদন গ্রাহ্য হবে।'

'রাজকাজে যদি বাধার সৃষ্টি না হয়।'

আবার হাসলো লুৎফ্-উন্নিসা। 'মাত্র একজন লোক দিল্লীশ্বরের কাজে বাধা হতে পারে না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, এখন শুনি, সাধটা কি?'

'সাধ হয়েছে একটা বিয়ে করব।'

হো-হো করে হেসে উঠলেন জাহাঁগীর। 'নূতন সাধ বটে। তা কোথাও সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে?'

'তা হয়েছে। কেবল রাজ-আজ্ঞা হলেই হয়। রাজার সম্মতি না পেলে কোনো সম্বন্ধই টিকতে পারে না।'

'আমার আবার সম্মতির দরকার কি? কাকে এই সুখের সাগরে ভাসাবে ঠিক করেছো?'

'দাসী দিল্লীশ্বরের সেবা করেছে বলে দ্বিচারিণী নয়। দাসী নিজের স্বামীকেই বিয়ে করার অনুমতি চাইছে।'

'বটে! এই পুরনো নফরের দশা কি করবে?'

'দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসাকে দিয়ে যাব।'

'দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসা-টা আবার কে?'

'যিনি হবেন।'

জাহাঁগীর বুঝলেন, মেহের-উন্নিসা যে দিল্লীর সম্রাজ্ঞী হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে লুৎফ্-উন্নিসা। নিজের আকাঙ্ক্ষা বিফল হয়েছে। এখন মানে মানে রাজপুরী থেকে সরে যেতে চায়।

একটু দুঃখিত হলেন জাহাঁগীর। কিছু বললেন না।

'জাহাঁপনার কি এ সম্বন্ধে সম্মতি নেই?' আবার জিজ্ঞেস করলো লুৎফ্-উন্নিসা।

'আমার অসম্মতি নেই। কিন্তু স্বামীর সাথে আবার বিয়ের দরকার কি?'

'কপাল খারাপ আমার, প্রথম বিয়েতে স্বামী আমাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেননি। এখন জাহাঁপনার দাসীকে ত্যাগ করতে পারবেন না।'

আপন মনে একটু হাসলেন বাদশাহ। বললেন, 'তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই, লুৎফ্-উন্নিসা। তোমার যদি সেই ইচ্ছেই হয়, তাহলে তা-ই করো। কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাবে কেন? এক আকাশে কি চাঁদ সূর্য দুই-ই ওঠে না? এক বৃন্তে

কি দুটি ফুল ফোটে না?'

লুৎফ্-উন্নিসার দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। বাদশাহর চোখে চোখে তাকিয়ে বললো, 'তুচ্ছ ফুল ফুটতে পারে। কিন্তু এক মৃণালে দুটি কমল কি কখনো ফোটে? আপনার রত্নসিংহাসনতলে কাঁটা হয়ে কেন থাকবো?'

নিজের ঘরে ফিরে গেল লুৎফ্-উন্নিসা।

হঠাৎ করে এমন ইচ্ছে কেন হলো তা জাহাঁগীরকে খুলে বলেনি ও। অনুমানে যেটুকু বোঝা যেতে যারে সেটুকু বুঝেই ক্ষান্ত হলেন বাদশাহ। ভেতরের কথা কিছুই জানতে পারলেন না। লুৎফ্-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ। সেলিমের রমণীহৃদয়জয়ী রাজসিক চেহারা কখনো তার মনকে ভোলায়নি। কিন্তু এবার পাষাণের ভেতর কীট ঢুকেছে।

পাঁচ

আত্মমন্দিরে

ঘরে ফিরে এসেছে লুৎফ্-উন্নিসা। মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছে ওর। পেষমন্‌কে ডেকে পোশাক বদলালো। সুবর্ণ মণি-মুক্তাখচিত পোশাক খুলে পেষমনের দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

'এই পোশাকটা তোমাকে দিলাম।'

অনেক দাম দিয়ে কয়েকদিন আগে মাত্র তৈরি করা হয়েছে পোশাকটা। 'এ পোশাক আমায় কেন?' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করলো পেষমন্। আজকের সংবাদ কি?'

'সংবাদ শুভ বটে।'

'তা তো বুঝতে পারছি। মেহের-উন্নিসার ভয় গেছে?'

'গেছে। এখন আর ও নিয়ে কোনো ভাবনা নেই।'

খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠলো পেষমন্। 'যাক, এত দিনে তাহলে বেগমের দাসী হলাম।'

'অত খুশি হওয়ার কিছু নেই। যদি তুমি বেগমের দাসী হতে চাও, তবে আমি মেহের-উন্নিসাকে বলে দেখবো।'

'সে কি? আপনিই না বললেন, বেগম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই মেহের-উন্নিসার।'

'অমন কথা আমি কখনো বলিনি। আমি বলেছি, ও নিয়ে কোন চিন্তা নেই আমার।'

'চিন্তা নেই কেন? আপনি আগ্রার একমাত্র অধিকারী না হলে যে সবই বৃথা হলো।'

'আগ্রার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না।'

'সে কি? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। আজকের শুভ সংবাদটা তাহলে

কি, বুঝিয়ে বলুন।'

'শুভ সংবাদ হলো, আমি জীবনের জন্যে আগ্রা ছেড়ে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'বাঙলাদেশে গিয়ে বাস করবো। পারলে কোনো ভদ্রলোকের গৃহিণী হবো।'

'এরকম কৌতুক নতুন বটে, কিন্তু শুনলে প্রাণ শিউরে ওঠে।'

'না পেষমন্ কৌতুক করছি না। সত্যি সত্যিই আমি আগ্রা ছেড়ে যাচ্ছি। বাদশাহর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি।'

'এমন জঘন্য ইচ্ছে আপনার কি করে হলো?'

'জঘন্য ইচ্ছে বলছো কেন? অনেকদিন তো আগ্রায় বেড়ালাম, কি লাভ হলো? ছেলেবেলা থেকেই সুখের তৃষ্ণা বড় প্রবল ছিলো। সেই সুখের আশায় বাঙলাদেশ ছেড়ে এতদূর এলাম। কি মূল্যই না দিয়েছি একটু সুখ কিনবার জন্যে? কোন্ দুষ্কর্ম না করেছি? ঐশ্বর্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সবই তো প্রচুর পরিমাণে ভোগ করলাম। এত করেও কি হলো? আজ এখানে বসে প্রত্যেকটা দিন মনে মনে গুণে বলতে পারি, এক মুহূর্তের জন্যেও কখনো সুখ পাইনি। একটু শান্তি পাইনি। তৃষ্ণাটা বেড়েছে শুধু।'

থামলো লুৎফ-উন্নিসা। একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগলো, 'চেষ্টা করলে আরো সম্পদ, আরো ঐশ্বর্য পেতে পারি। কিন্তু কি জন্যে? এ সবে যদি সুখ থাকতো, তবে এত দিনে এক দিনের জন্যে হলেও সুখী হতাম। সুখের এই আকাঙ্ক্ষা পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণার মতো—প্রথমে নির্মল, ক্ষীণ ধারা নেমে আসে; আপনার ভেতরে আপনিই লুকিয়ে থাকে, কেউ জানতে পারে না; নিজে নিজেই কলকল করে, কেউ শোনে না। ধীরে ধীরে যত এগোতে থাকে, শরীর তত বাড়তে থাকে, পঙ্কিল হতে থাকে। শুধু তা-ই নয়, কখনো আবার বাতাস বয়, ঢেউ ওঠে, মাছ-কুমীর বাস করে। শরীর আরো বাড়ে, জল আরো ঘোলা হয়, নোনা হয়, অগণিত সৈকত-চর—মরুভূমির মতো নদীহৃদয়ে বাস করে। তারপর এক সময় সাগরে গিয়ে মেশে নদী। স্রোত কোথায় হারিয়ে যায় কে বলবে?'

'আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারলাম না,' অবাক গলায় বললো পেষমন্। 'ধন-ঐশ্বর্যে আপনার সুখ হয় না কেন?'

'কেন হয় না, তা এতদিনে বুঝেছি। তিন বছর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসে যে সুখ হয়নি, উড়িষ্যা থেকে ফেরার পথে এক রাতে সে সুখ হয়েছে। এতেই বুঝেছি।'

'কি বুঝেছেন?'

'এত দিন হিন্দুদের দেবমূর্তির মতো ছিলাম আমি। বাইরে সুবর্ণ রত্নে খচিত, ভেতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয় সুখের খোঁজে আগুনের ভেতর বেড়িয়েছি, কখনো আগুন স্পর্শ করিনি। এখন একবার দেখি, পাথরের ভেতর একটা রক্তশিরাওয়ালা মন পাই কিনা।'

'এ-ও তো কিছু বুঝতে পারলাম না।'

'এই আগ্রায় কখনো কাউকে ভালোবেসেছি আমি?'

'কাউকেই না,' চুপি চুপি বললো পেষমন্।

'তা হলে আমি পাষাণী নই তো কি?'

'তা এখন যদি ভালোবাসতে ইচ্ছে হয় তো বাসেন না কেন?'

'সে জন্যেই তো আগ্রা ছেড়ে যাচ্ছি।'

'তারই বা কি দরকার? আগ্রায় কি মানুষ নেই যে চোয়াড়ের দেশে যাবেন? এখন যিনি আপনাকে ভালোবাসেন তাকেই কেন ভালোবাসেন না? রূপে বলুন, ধনে বলুন, ঐশ্বর্যে বলুন, যা-তেই বলুন, দিল্লীর বাদশাহর চেয়ে বড় পৃথিবীতে আর কে আছে?'

'আকাশে চাঁদ সূর্য থাকতে জল নিচের দিকে যায় কেন?'

'কেন?'

'কপালের লিখন।'

সব কথা খুলে বললো না লুৎফ্-উন্নিসা। পাষাণের ভেতর আগুন ঢুকেছে। পাথর গলছে।

ছয়

চরণতলে

জমিতে বীজ রোপন করলে আপনিই অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয়, তখন কেউ জানতে পারে না—কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপন করলে, যে রোপন করেছিলো সে যেখানেই থাকুক না কেন, ক্রমে অঙ্কুর থেকে গাছ মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে। আজ গাছটি আঙুলের সমান মাত্র, কেউ দেখেও দেখতে পায় না। কিন্তু একটু একটু করে হলেও বাড়ছে। এক সময় গাছটি আধ হাত, একহাত, দুই হাত সমান লম্বা হলো; তবু যদি তাতে কারো স্বার্থ উদ্ধারের সম্ভাবনা না থাকে, কেউ দেখে না, দেখেও দেখে না। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়; হঠাৎ এক দিন তার ওপর চোখ পড়ে। আর অমনোযোগের অবকাশ নেই—কোন্ দিন যেন গাছ বড় হয়ে গেছে, তার ছায়ায় অন্য গাছ নষ্ট হচ্ছে। এখন একটাই পথ, হয় অন্য গাছ বাঁচানোর জন্যে কেটে ফেলতে হবে নয়তো, অন্য গাছ রসাতলে যাক, আরো বেড়ে উঠতে দিতে হবে সেটাকে।

লুৎফ্-উন্নিসার প্রেম এমন বেড়েছে। প্রথমে একদিন হঠাৎ প্রেমিকের সাথে দেখা হলো, প্রেমের কথা খুব একটা জানতে পারলো না। কিন্তু তখনই বীজ রোপন হয়ে গেল। তার পরে আর দেখা হলো না প্রেমিকের সাথে। কিন্তু না দেখার কারণেই সেই মুখ বার বার মনে পড়তে লাগলো। স্মৃতিপটে সেই মুখের ছবি আঁকা সুখের বলে মনে হতে লাগলো। বীজ থেকে অঙ্কুর বেরোলো। অনেক দিন না দেখা সেই মুখটার ওপর অনুরাগ জন্মালো। মনের ধর্ম হলো, যে মানসিক কাজ যত বেশি বার করা যায় সে কাজ করতে তত বেশি ইচ্ছে হয়; এক সময় স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায় তা। লুৎফ্-উন্নিসা প্রতিনিয়ত সেই মুখের কথা ভাবতে লাগলো। মাত্র একবারের জন্যে হলেও মুখটা দেখার জন্যে পাগল হয়ে উঠলো ও মনে মনে। দুনিয়ার কোনো

কিছুতেই আর তার প্রবৃত্তি নেই। দিল্লীর সিংহাসনের লোভও কোথায় চলে গেল! রাজ্য, রাজধানী, রাজসিংহাসন, সব বিসর্জন দিয়ে প্রিয়জনকে দেখার জন্যে ধেয়ে চললো ওর মন। সেই প্রিয়জন নবকুমার।

এ জন্যেই মেহের-উন্নিসার নিরাশাজনক কথা শুনেও দুঃখিত হয়নি লুৎফ্-উন্নিসা। এ জন্যেই আগ্রায় এসে ধন সম্পদ রক্ষার কোনো চেষ্টা করলো না ও। এ জন্যেই জন্মের মতো বিদায় নিয়েছে বাদশাহর কাছ থেকে।

সপ্তগ্রামে এলো লুৎফ্-উন্নিসা। নগরীর প্রধান রাজপথের ওপর এক অট্টালিকায় আপাতত বাস করার সিদ্ধান্ত নিলো। রাজপথের পথিকরা দেখলো, হঠাৎ অট্টালিকাটি মূল্যবান কাপড়চোপড় পরা দাসদাসীতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফুল এবং আরো নানা রকম সুগন্ধি জিনিসে মৌ-মৌ করছে সব জায়গা। সোনা, রূপা, হাতির দাঁতের কাজ করা নানা জিনিস দিয়ে চমৎকার করে সাজানো হয়েছে ঘরগুলো।

এই রকম একটা সাজানো কামরায় মাথা নিচু করে বসে আছে লুৎফ্-উন্নিসা। অন্য একটা আসনে বসে আছে নবকুমার। দুজনই চুপ। সপ্তগ্রামে আসার পর এর আগেও দু-একবার নবকুমারের সাথে দেখা হয়েছে লুৎফ্-উন্নিসার। মূলতঃ ওরই ইচ্ছায় ঘটেছে দেখা হওয়ার ঘটনাগুলো। কিন্তু আশা পূর্ণ হয়নি লুৎফ্-উন্নিসার। আজও অবস্থার কোনো উন্নতি হয়েছে বলে মনে হলো না।

'আমি তাহলে চললাম।' নীরবতা ভাঙলো নবকুমার। 'তুমি ডেকো না আমাকে।'

'যেও না,' ব্যাকুল গলায় বললো লুৎফ্-উন্নিসা। 'আর একটু থাকো। আমার কথা শেষ হয়নি এখনো।'

অপেক্ষা করতে লাগলো নবকুমার। কিন্তু লুৎফ্-উন্নিসা কিছু বললো না। কিছুক্ষণ পর নবকুমার জিজ্ঞেস করলো, 'আর কি বলবে?'

কোনো উত্তর দিলো না লুৎফ্-উন্নিসা—নিঃশব্দে কাঁদছে সে।

বিব্রতভাবে উঠে দাঁড়ালো নবকুমার। হাত বাড়িয়ে তার কাপড়ের খুঁট ধরে ফেললো লুৎফ্-উন্নিসা।

'কি, বলবে তো?' বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো নবকুমার।

'তুমি কি চাও?' বললো লুৎফ্-উন্নিসা। 'পৃথিবীতে কিছুই কি নেই তোমার চাওয়ার মতো? ধন, সম্পদ, মান, প্রেম, রঙ্গ, রহস্য; পৃথিবীতে যাকে যাকে সুখ বলে, সবই দেব। প্রতিদানে কিছুই চাই না, কেবল তোমার দাসী হতে চাই। তোমার যে স্ত্রী হবো, এ গৌরব চাই না, কেবল দাসী!'

'আমি গরিব ব্রাহ্মণ, এ জীবনে গরিব ব্রাহ্মণই থাকবো। তোমার মত সম্পদ নিয়ে বিধর্মীর উপপতি হতে চাই না।'

বিধর্মীর উপপতি! নবকুমার এখনো জানতে পারেনি, এই নারী তার প্রথম স্ত্রী পদ্মাবতী।

মুখ নিচু করে বসে রইলো লুৎফ্-উন্নিসা। ওর হাত থেকে কাপড়ের প্রান্তটা ছাড়িয়ে নিলো নবকুমার। একটু এগিয়ে এসে আবার ধরলো লুৎফ্-উন্নিসা কাপড়ের

খুঁট।

'ঠিক আছে,' বললো ও। 'বিধাতার যদি সেই ইচ্ছে, তবে মনের সাধ আহ্লাদ সব অতল জলে ডোবাবো। আর কিছু চাই না, রোজ একবার তুমি এপথে যেও, দাসী ভেবে একবার দেখা দিও, দুচোখ ভরে আমি একটু দেখবো শুধু।'

'তুমি বিধর্মী—পরস্ত্রী—তোমার সাথে এমন আলাপেও দোষ। তোমার সাথে আর দেখা হবে না আমার।'

দুজনেই নীরব আবার। লুৎফ্-উন্নিসার হৃদয়ে ঝড় বইছে। পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলো সে।

কিছুক্ষণ পর নবকুমারের কাপড়ের প্রান্তটা ছেড়ে দিয়ে বললো, 'যাও।'

পা বাড়ালো নবকুমার। দু'পাও যেতে পারেনি, হঠাৎ ঝড়ে ওপড়ানো গাছের মতো ওর পায়ের ওপর আছড়ে পড়লো লুৎফ্-উন্নিসা। দু'হাতে জাপটে ধরলো পা দুটো।

'নির্দয়!' কাতর গলায় বললো লুৎফ্-উন্নিসা, 'আমি তোমার জন্যে আগ্রার সিংহাসন ছেড়ে এসেছি! তুমি আমায় ছেড়ে যেও না, যেও না!'

'তুমি আবার আগ্রায় ফিরে যাও, আমার আশা ছেড়ে দাও।'

'এ জীবনে না।' ঝট করে উঠে দাঁড়ালো লুৎফ্-উন্নিসা। সদর্পে বললো, 'এ জীবনে তোমার আশা ছাড়বো না।'

মাথা উঁচু করে, গ্রীবা সামান্য বাঁকিয়ে দাঁড়িয়েছে রাজরাজমোহিনী। নবকুমারের চোখে চোখে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। যে অনমনীয় গর্ব হৃদয়ের আগুনে গলে গিয়েছিলো, আবার তার জ্যোতি ঝলকে উঠলো। যে অজেয় মানসিক শক্তি ভারত শাসনের কল্পনায় ভীত হয়নি, প্রেমকাতর শরীরে আবার সেই শক্তি সঞ্চারিত হলো। কপালের শিরাগুলো সব ফুলে উঠলো উত্তেজনায়। সূর্যের আলো পড়ে সাগরের পানি যেমন ঝকমক করে ওঠে, তেমনি ঝকমক করে উঠলো চোখ দুটো। নাকের বাঁশি কাঁপতে লাগলো। গায়ে পাড়া পড়লে সাপ যেমন ফণা তুলে দাঁড়ায়, তেমনি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে উন্মাদিনী লুৎফ্-উন্নিসা। বললো, 'এ জীবনে তোমার আশা ছাড়বো না। তুমি আমারই হবে।'

লুৎফ্-উন্নিসার এই ফুঁসে ওঠা মূর্তির দিকে তাকিয়ে ভয় পেলো নবকুমার। ওর এমন চেহারা আর কখনো দেখেনি সে। চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতে যাবে, তখন হঠাৎ করে এমনই তেজোময়ী আরেকটি মূর্তি ভেসে উঠলো ওর মনের পর্দায়।

অনেক দিন আগের কথা। প্রথম স্ত্রী পদ্মাবতীর সাথে তখনো ছাড়াছাড়ি হয়নি ওর। পদ্মাবতীর বয়েস তখন মাত্র বারো। একদিন কি কারণে যেন রেগে গিয়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দিতে গিয়েছিলো ও। বারো বছরের মেয়ে তখন এমনি ফণা তোলা সাপের মতো ফিরে দাঁড়িয়েছিলো। ঠিক এমন করেই জ্বলে উঠেছিলো তার চোখ। এমনই ফুলে উঠেছিলো কপালের শিরাগুলো। এমনই কেঁপে উঠেছিলো নাকের বাঁশি। এমনই গ্রীবা বাঁকিয়ে সেদিন দাঁড়িয়েছিলো পদ্মাবতী। অনেক দিন সেমুখ মনে পড়েনি। এখন পড়লো। অমনি দেখতে পেলো মিলটা। সংশয় দেখা দিলো নবকুমারের মনে। সংকুচিত গলায় ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলো,

'তুমি কে?'

লুৎফ্-উন্নিসার চোখদুটো আর একটু বড় হলো যেন। 'আমি পদ্মাবতী।'

উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল লুৎফ্-উন্নিসা। নবকুমারও ধীর পায়ে, কিছুটা শঙ্কিত হৃদয়ে রাজপথে এসে নামলো।

সাত

উপনগরপ্রান্তে

নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলো লুৎফ্-উন্নিসা। দু'দিনের ভেতর আর সে বেরোলো না ঘর থেকে। ভালো করে ভেবেচিন্তে, সবদিক বিবেচনা করে ঠিক করলো এবার কি করবে। দু'দিন পর যখন ঘর থেকে বেরোলো, তখন ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, মনে মনে সাজানো হয়ে গেছে পরিকল্পনা।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পেষমনের সাহায্য নিয়ে কাপড় পরছে লুৎফ্-উন্নিসা। আশ্চর্য পোশাক-আশাক। মেয়েরা কখনোই এমন পোশাক পরে না।

কাপড় পরা শেষ করে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ঘুরেফিরে একবার দেখলো আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব।

'কেমন, পেষমন্, আর আমাকে চেনা যায়?'

'কার সাধ্য?'

'তাহলে আমি চললাম। ওদের বলে দাও, আমার সাথে কাউকে যেতে হবে না।'

'যদি দাসীর অপরাধ ক্ষমা করেন,' সংকুচিত ভাবে বললো পেষমন্, 'তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'কি?'

'আপনার উদ্দেশ্য কি?'

'আপাতত কপালকুণ্ডলার সাথে স্বামীর চিরবিচ্ছেদ। পরে তিনি আমার হবেন।'

'বেগম সাহেবা, ভালো করে ভেবে দেখুন, সে জায়গা নিবিড় বন, সামনে রাত, আপনি একা একা···।'

আর কিছু বলার সুযোগ পেলো না পেষমন্। ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে লুৎফ্-উন্নিসা।

সপ্তগ্রামের যে জনহীন জংলা এলাকায় নবকুমারের বাড়ি, সেদিকে হেঁটে চলেছে লুৎফ্-উন্নিসা। সন্ধ্যার আঁধার ক্রমে গাঢ় হয়ে আসছে। আকাশে উঁকি দিতে শুরু করেছে মিটমিটে দু'একটা তারা। সামনে পেছনে দু'দিকেই নির্জন পথ। কিন্তু একটুও ঘাবড়ালো না লুৎফ্-উন্নিসা। নবকুমারের বাড়ির কাছাকাছি যখন পৌছুলো, তখন পুরো রাত হয়ে গেছে।

নবকুমারের বাড়ির ঠিক পেছনেই ঘন বন। বনের প্রান্তে পৌছে একটা গাছের

নিচে বসলো লুৎফ্-উন্নিসা। এতটা পথ হেঁটে ক্লান্ত লাগছে, একটু জিরিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া যে কাজ করতে চলেছে সে সম্পর্কে শেষবারের মতো একটু ভেবেও নিতে চায়।

হঠাৎ অস্পষ্ট একটা আওয়াজ কানে গেল ওর। মানুষের গলার আওয়াজ। খুব আস্তে, অনেক দূর থেকে আসছে যেন। একঘেয়ে স্বরে কিছু একটা বলে চলেছে কেউ।

কান খাড়া করে উঠে দাঁড়ালো লুৎফ্-উন্নিসা। শব্দটা যেদিক থেকে আসছে তাকালো সেদিকে। প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না। একটু উঁচু হয়ে ভালো করে তাকালো। এবার দেখতে পেলো, বনের ভেতর সামান্য দূরে একটা আলো জ্বলছে।

সাহসে অনেক পুরুষের চেয়ে বড় লুৎফ্-উন্নিসা। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো সে। অল্প সময়েই পৌঁছে গেল আলোর উৎসের কাছাকাছি। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখলো, যে আলো জ্বলছে তা হোমের আলো, যে শব্দ শুনতে পাচ্ছে, তা মন্ত্র উচ্চারণের শব্দ। মন্ত্রের একটামাত্র শব্দ বুঝতে পারলো ও, একটা নাম—খুবই পরিচিত একটা নাম। নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো লুৎফ্-উন্নিসা। অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে মন্ত্র জপছে যে লোকটা, তার কাছে গিয়ে বসলো।

চতুর্থ খণ্ড

এক

শয়নাগারে

কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে বাড়ি আসার সময় যেদিন নবকুমারের সাথে লুৎফ্-উন্নিসার দেখা হয়েছিলো তারপর এক বছরেরও বেশি পেরিয়ে গেছে। এর ভেতর বর্ধমান হয়ে আগ্রায় গেছে লুৎফ্-উন্নিসা এবং পরে সেখান থেকে সপ্তগ্রামে এসেছে। এই এক বছরেরও বেশি সময় ধরে নবকুমারের গৃহিণী কপালকুণ্ডলা।

যেদিন সন্ধ্যায় লুৎফ্-উন্নিসা বনে, সেদিনই সন্ধ্যায় নিজের ঘরে বসে আছে কপালকুণ্ডলা। সমুদ্রতীরে এলোচুল, অলঙ্কারহীন যে কপালকুণ্ডলাকে দেখেছিলো নবকুমার সেই কপালকুণ্ডলার সাথে আজকের কপালকুণ্ডলার পার্থক্য অনেক। শ্যামাসুন্দরীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছে, পরশ পাথরের স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হয়েছে। লম্বা, কালো এলোচুল বেণীর বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। দু'একটা অবাধ্য চুল উঁকিঝুঁকি মারছে তার ভেতর থেকে। নানা ফুলের সমারোহ সেই বেণীর সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে তুলেছে। দুই কানে সোনার দুল দুলছে। গলায় হিরণ্ময় হার। পরনে সাধারণ অথচ সুরুচিপূর্ণ কাপড়। সব মিলিয়ে সেদিনের কপালকুণ্ডলাকে আর চেনা যায় না, সত্যি সত্যিই মৃণ্ময়ী হয়ে উঠেছে সে।

গায়ের রঙ এখনো আগের মতোই, কিন্তু একটু যেন কিসের ছায়া পড়েছে তাতে। যেন আকাশের প্রান্তে কোথায় কালো মেঘ দেখা দিয়েছে এক টুকরো। কপালকুণ্ডলা বসে আছে। তবে একা নয়, সখী শ্যামাসুন্দরীও আছে কাছে। মৃদুস্বরে আলাপ করছে দু'জন।

'ঠাকুর জামাই আর কতদিন এখানে থাকবেন?' জিজ্ঞেস করলো কপালকুণ্ডলা।

শ্যামাসুন্দরী বললো, 'কাল বিকেলে চলে যাবে। আহা! আজ রাতে যদি ওষুধটা তুলে রাখতাম, তবু তাকে বশ করে মানবজন্ম সার্থক করতে পারতাম। কাল রাতে বের হয়েছিলাম বলে তো লাথি ঝাঁটা খেলাম, আজ আবার বের হবো কি করে?'

'দিনে তুললে না কেন?'

'দিনে তুললে ফলবে না। রাত ঠিক দুই প্রহরে এলো চুলে তুলতে হয়। যাকগে, ভাই, মনের সাধ মনেই রইলো।'

'আচ্ছা, আমি তো আজ দিনে সে গাছ চিনে এসেছি, আর, যে বনে হয় তা-ও দেখে এসেছি। আজ আর যেতে হবে না তোমাকে, আমি গিয়ে তুলে আনবো ওষুধ।'

'না না, একদিন যা হয়েছে তা হয়েছে। রাতে একা একা তুমি আর বের হয়ো

না।'

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। শুনেছো তো, রাতে বেড়ানো আমার ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস। একবার ভেবে দেখ, আমার যদি এ অভ্যাস না থাকতো, তাহলে তোমার সাথে কখনোই আমার দেখা হতো না।'

'তা তো জানি। কিন্তু রাতের বেলা একা বনে বনে বেড়ানো কি গৃহস্থের বউ-ঝিদের মানায়? কাল দু'জনে গিয়েও এত বকা খেলাম, আজ তুমি একা গেলে আর কি রক্ষা থাকবে?'

'ক্ষতিই বা কি? তুমিও কি ভাবছো, আমি রাতের বেলা ঘরের বাইরে গেলেই কুচরিত্রা হয়ে যাবো?'

'আমি তা মনে করি না। কিন্তু মন্দ লোকে মন্দ কথা বলবে।'

'বলুক, আমি তাতে মন্দ হবো না।'

'তা তো হবে না, কিন্তু তোমাকে কেউ কিছু মন্দ বললে আমাদের যে মনে মনে কষ্ট হবে।'

'এমন অন্যায় কষ্ট হতে দিও না।'

'তা-ও আমি পারবো। কিন্তু দাদাকে কেন কষ্ট দেবে?'

স্থির চোখে শ্যামাসুন্দরীর দিকে তাকালো কপালকুণ্ডলা। বললো, 'এতে যদি তিনি কষ্ট পান তো আমি কি করবো? আগে যদি জানতাম, মেয়ে মানুষের বিয়ে মানে দাসীত্ব, তাহলে কক্ষণো বিয়ে করতাম না।'

এরপরে আর কথা বলা সমীচীন মনে করলো না শ্যামাসুন্দরী। নিজের কাজ করতে উঠে গেল। কপালকুণ্ডলাও ঘরের কাজে মন দিলো।

রাত্রি এক প্রহর পেরিয়ে গেছে। ঘরের কাজ শেষ করে ওষুধের গাছ খুঁজতে যাওয়ার জন্যে বের হলো কপালকুণ্ডলা। জ্যোৎস্না রাত। বাইরের ঘরে বসে ছিলো নবকুমার। জানালা দিয়ে দেখতে পেলো, মৃণ্ময়ী বের হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ও-ও বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে। হাত ধরলো মৃণ্ময়ীর।

'কি?' জিজ্ঞেস করলো কপালকুণ্ডলা।

'কোথায় যাচ্ছো?' কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলো নবকুমার। পুরোপুরি স্বাভাবিক ওর কণ্ঠস্বর। অভিযোগ বা কৈফিয়ৎ চাওয়ার চিহ্নমাত্র নেই সে গলায়।

'স্বামীকে বশ করার জন্যে ওষুধ চায় শ্যামাসুন্দরী, আমি সেই ওষুধ খুঁজতে যাচ্ছি।'

'বেশ, কাল তো একবার গিয়েছিলে।' আগের মতোই কোমল নবকুমারের স্বর। 'আজ আবার কেন?'

'কাল খুঁজে পাইনি, আজ আবার খুঁজবো।'

'ভালো, দিনে খুঁজলেও তো হয়।' আর একটু নরম হলো নবকুমারের গলা।

'দিনে তুললে এ ওষুধ ফলে না।'

'কাজ কি তোমার ওষুধ খুঁজে? আমাকে গাছের নাম বলে দাও, আমি তুলে এনে দিচ্ছি।'

‘গাছের নাম আমি জানি না, দেখলে চিনতে পারি। আর, তুমি তুললেও ফলবে না ওষুধ। মেয়েলোকে এলোচুলে তুলতে হয়। এখন যেতে দাও আমাকে, পরের উপকারে ব্যাঘাত কোরো না।’

শেষের কথা ক’টা একটু রুক্ষ স্বরে বললো কপালকুণ্ডলা। আর আপত্তি করলো না নবকুমার। মৃদুস্বরে বললো, ‘চলো, আমিও যাই তোমার সাথে।’

অদ্ভুত শান্ত দৃষ্টিতে নবকুমারের চোখের দিকে তাকালো কপালকুণ্ডলা।

‘এসো, আমি অবিশ্বাসিনী কিনা, নিজের চোখে দেখে যাও!’

আর কিছু বলতে পারলো না নবকুমার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছেড়ে দিলো কপালকুণ্ডলার হাত। এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরের দিকে ফিরে চললো ও। একা একা বনের ভেতরে ঢুকলো কপালকুণ্ডলা।

দুই

কাননতলে

সরু বনপথ ধরে একা একা ওষধির খোঁজে চলেছে কপালকুণ্ডলা। চারপাশে নিথর নিস্তব্ধ রাত। আকাশে চাঁদ, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ছড়িয়ে চলেছে। নীরবে পেরিয়ে যাচ্ছে শাদা শাদা মেঘের দল। ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে বুনো গাছাপালাগুলো তেমনি নীরবে শীতল চাঁদের আলোয় বিশ্রাম করছে। গাছের পাতাগুলোও নীরবে সে জ্যোৎস্না প্রতিফলিত করছে। লতাগুল্মের ভেতর ফুটে আছে শাদা ফুল—তা-ও নীরব। পশু পাখি নীরব। মাঝে মাঝে কেবল শোনা যাচ্ছে রাতজাগা কোনো পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ। হঠাৎ কোথাও একটা শুকনো পাতা খসে পড়ার আওয়াজ। কখনো বা কোনো সরীসৃপের গাছতলের শুকনো পাতা মাড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। হঠাৎ হঠাৎ অনেক দূর কোথাও থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক। এমন নয় যে বাতাস একেবারে নেই—চৈত্রের শরীর জুড়ানো বাতাস অত্যন্ত ধীরে, নিঃশব্দে বইছে। তাতে গাছের আগার দিকের পাতাগুলো একটু দুলছে শুধু, শব্দ করছে না কোনো।

নীরবে, নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে কপালকুণ্ডলা। পুরনো দিনের স্মৃতি জেগে উঠছে ওর মনে। বালিয়াড়ির চূড়ায় সাগর থেকে ভেসে আসা হালকা বাতাসে ওর চুল উড়তো। স্বচ্ছ নিল আকাশের দিকে তাকালো। সাথে সাথে মনে পড়ে গেল, এই আকাশের মতোই বিশাল দিগন্ত বিস্তৃত সেই সমুদ্রের কথা। আনমনা হয়ে গেল কপালকুণ্ডলা। ভুলে গেল কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে নিবিড় বনে চলে এলো ও। পথ দুর্গম হয়ে উঠলো। মাথার ওপর গাছের ডাল পাতায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ। রাতের আঁধার আরো গাঢ় হলো যেন। পথচলা যখন অসম্ভব হয়ে পড়লো তখন সংবিৎ ফিরলো কপালকুণ্ডলার। এদিক ওদিক তাকালো, কোথায় এসে পড়েছে বোঝার জন্যে। হঠাৎ খেয়াল করলো, গহন বনের এক জায়গায় আলো জ্বলছে।

ছেলেবেলা থেকে সাগর পাড়ের গহীন অরণ্যে বেড়ে উঠেছে কপালকুণ্ডলা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ভয় পায় না ও। বরং একটু কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সেই আলোর উৎসের দিকে এগিয়ে চললো ও। কিছুদূর এগোতেই দেখতে পেলো, ছোট্ট একটা অগ্নিকুণ্ড একটা গাছের নিচে। কোনো লোক নেই সেখানে। সামান্য দূরে ইটের তৈরি একটা ছোট্ট কুটির; গাছাপালা, ঝোপ ঝাড়ের জন্যে ভালো দেখা যাচ্ছে না। একটাই মাত্র ঘর। মানুষের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে সেই ঘর থেকে।

নিঃশব্দ পায়ে কুটিরের কাছে গেল কপালকুণ্ডলা। এখন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে আওয়াজ। মনে হচ্ছে খুব সতর্কতার সাথে আলাপ করছে দুজন লোক। কিন্তু কি, তা বুঝতে পারলো না ও।

আরেকটু এগিয়ে কান খাড়া করলো কপালকুণ্ডলা। এবার বুঝতে পারছে কথাগুলো।

একজন বলছে, 'আমার অভীষ্ট মৃত্যু।' গম্ভীর আর ভারি গলাটা। 'এতে যদি তুমি রাজি না থাকো, আমি সাহায্য করবো না তোমাকে; তুমিও আমাকে সহায়তা কোরো না।'

'আমিও ওর ভালো চাই না,' জবাব দিলো অন্যজন। 'জীবনের জন্যে নির্বাসন হয় এমন কিছু হলে রাজি আছি। কিন্তু হত্যার কোনো চেষ্টা আমার দ্বারা হবে না; বরং বিরোধিতাই করবো।'

'তুমি অতি অবোধ, অজ্ঞান। তোমায় কিছু জ্ঞানদান করছি, মন দিয়ে শোনো। অত্যন্ত গোপন একটা কথা বলবো; তার আগে চারদিক একবার দেখে এসো, মানুষের নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি যেন।'

কথাবার্তা ভালো করে শোনবার জন্যে দেয়ালের একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কপালকুণ্ডলা। উত্তেজনা আর শঙ্কায় সত্যিই ঘন ঘন আর ভারি শ্বাস বইছে ওর। ঘরে ভেতরের কথাটা শোনামাত্রই সচকিত হলো ও। শ্বাস বন্ধ করে ভাবলো পালাবে কিনা।

এমন সময় একজন বেরিয়ে এলো কুটির ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখতে পেলো কপালকুণ্ডলাকে। কপালকুণ্ডলাও পরিষ্কার চাঁদের আলোয় দেখতে পেলো আগন্তুক পুরুষের অবয়বটা। দেখে ভয় পাবে না খুশি হবে বুঝতে পারলো না। ব্রাহ্মণের পোশাক আগন্তুকের গায়ে। সামান্য ধুতি পরা। উত্তরীয়ে জড়ানো শরীর। বয়সের কিছুমাত্র চিহ্ন নেই মুখে। দেখলে মনে হয় সবে কৈশোর পেরিয়েছে। মুখটা খুব সুন্দর। সুন্দরী মেয়ের মুখের মতো সুন্দর। মেয়েদের ভেতর দেখা যায় না এমন একটা দৃঢ়তা আছে তার চেহারায়। পুরুষের চুলের মতো ছোট ছোট করে ছাঁটা নয় চুলগুলো। মেয়েদের মতো লম্বা; ছড়িয়ে আছে পিঠে, কাঁধে, বাহুতে। বুকের ওপরেও এসে পড়েছে দু'একগুচ্ছ চুল। চওড়া কপাল, সামান্য ফোলা, মাঝখানে একটু উঁচু হয়ে আছে একটা শিরা। চোখ দুটোয় বিদ্যুতের তেজ। কিন্তু এই সৌন্দর্যের ভেতরেও কেমন একটা ভয়ঙ্কর ভাব যেন ফুটে উঠেছে যুবকের চেহারায়। খাপখোলা লম্বা একটা তরবারি তার হাতে। কোনো করাল কামনার

ছায়া যেন পড়েছে ফর্সা মুখটায়। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে সে কপালকুণ্ডলার দিকে। যেন দেখে নিচ্ছে অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত। ভয় পেয়ে গেল কপালকুণ্ডলা।

দুজনেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো দুজনের দিকে। দুজনেই নীরব। চোখে পলক পর্যন্ত পড়ছে না।

যুবকই প্রথম সংবিৎ ফিরে পেলো।

'কে তুমি?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো সে। এক বছর আগে হিজলীর কেয়াবনে যদি কেউ এ প্রশ্ন করতো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সংগত জবাব দিতে পারতো কপালকুণ্ডলা। কিন্তু এখন ও কিছুটা হলেও গৃহস্থ রমণী, ঝটপট উত্তর দিতে পারলো না।

ওকে নিরুত্তর দেখে ব্রাহ্মণবেশী গম্ভীর অথচ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'কপালকুণ্ডলা, এত রাতে এই গহন বনে কি জন্যে এসেছো তুমি?'

অপরিচিত নিশাচর পুরুষের মুখে নিজের নাম শুনে অবাক হলো কপালকুণ্ডলা। ভয় একটু বাড়লো ওর। এবারও কোনো জবাব বেরোলো না মুখ দিয়ে।

'তুমি আমাদের কথাবার্তা শুনেছো?' আবার জিজ্ঞেস করলো ব্রাহ্মণবেশী যুবক।

হঠাৎই যেন কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেলো কপালকুণ্ডলা। যুবকের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললো, 'আমিও তাই জিজ্ঞেস করছি, এই রাতে বনের ভেতর কি কুপরামর্শ করছিলে তোমরা দু'জনে?'

জবাব দিলো না যুবক। নীরবে ভাবছে কি যেন। কাজ উদ্ধারের নতুন একটা ফন্দি মাথায় এসেছে। কপালকুণ্ডলার হাত ধরলো সে। টেনে নিয়ে চললো কুটির থেকে দূরে। ভীষণ রাগ হলো কপালকুণ্ডলার। ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিলো হাত।

'চিন্তা কি?' কপালকুণ্ডলার কানের কাছে মুখ এনে অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললো যুবক। 'আমি পুরুষ নই।'

আরো অবাক হলো কপালকুণ্ডলা। কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস হলো না ওর। একেবারে যে অবিশ্বাস হলো, তা-ও নয়। নীরবে ব্রাহ্মণবেশীর সাথে চললো ও।

কুটির থেকে বেশ কিছুটা দূরে এসে আগন্তুক ওর কানে কানে বললো, 'আমরা কি কুপরামর্শ করছিলাম, শুনবে? তা তোমারই সম্পর্কে।'

আগ্রহ বাড়লো কপালকুণ্ডলার। 'শুনবো।'

'তা হলে যতক্ষণ ফিরে না আসি, অপেক্ষা করো এখানে।'

কুটিরের দিকে চলে গেল ছদ্মবেশী।

চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলো কপালকুণ্ডলা। যা দেখেছে আর শুনেছে তাতে বেশ ভয় পেয়েছে ও। একা একা অন্ধকার বনের ভেতর বসে থাকতে থাকতে আরো বেড়ে উঠলো উদ্বেগ। বিশেষ করে এই ছদ্মবেশী কি উদ্দেশ্যে ওকে বসিয়ে রেখে গেল, তা কে বলতে পারে? সুযোগ পেয়ে নিজের কুমতলব সফল করার জন্যেই হয়তো বসিয়ে রেখে গেছে। কি করবে বুঝতে পারছে না ও।

বেশ কিছুক্ষণ হয় কুটিরের দিকে গেছে ছদ্মবেশী। এখনো ফেরার নাম নেই। আর বসা যায় না। উঠলো কপালকুণ্ডলা। দ্রুতপায়ে এগোলো বাড়ির দিকে। কখন

যে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে খেয়াল করেনি ও। রওনা হতে না হতেই ঢাকা পড়ে গেল চাঁদ। বনের ভেতর যে সামান্য আলো ছিলো তা-ও ঢেকে গেল নিকষ-কালো আঁধারে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো কপালকুণ্ডলা। হঠাৎ খসখস একটা শব্দ হলো পেছনে। কেউ যেন সন্তর্পণে পা ফেলছে। অনুসরণ করছে কেউ? পেছন ফিরে তাকালো ও। কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে দেখতে পেলো না কিছু। ব্রাহ্মণবেশী হয়তো আসছে পেছন পেছন, ভাবলো কপালকুণ্ডলা।

সেই সরু বনপথের কাছে চলে এসেছে ও। এখানে অন্ধকার তত গাঢ় নয়। দৃষ্টিপথে মানুষজন থাকলে দেখা যায়। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না কপালকুণ্ডলা। একবার ভাবলো, একটু অপেক্ষা করে। পরমুহূর্তে ভাবলো, দরকার নেই। দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললো ও।

অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে কপালকুণ্ডলা। সারা আকাশ ছেয়ে গেছে ভীষণ নীল মেঘে। যে কোনো মুহূর্তে শুরু হয়ে যাবে ঝড়বাদল। থম মেরে গেছে প্রকৃতি। এমন সময় আবার পেছনে পায়ের আওয়াজ। আরো দ্রুত চলতে লাগলো ও।

প্রায় এসে গেছে বাড়ির কাছে। আর সামান্য পথ। কিন্তু সেটুকু পেরোতে পারলো না কপালকুণ্ডলা। ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জে উঠলো মেঘ। শুরু হয়ে গেল ঝড়। সেই সাথে প্রবল বর্ষণ। ছুটতে শুরু করলো ও। পেছন পেছন যে আসছে ছুটলো সে-ও, শব্দ শুনে তেমনই মনে হলো কপালকুণ্ডলার।

বাড়ি পর্যন্ত পৌছুতে পৌছুতে পুরো ভিজে গেল ও। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছে একটার পর একটা। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। কোনো রকমে বাড়ির কাছ পর্যন্ত এলো কপালকুণ্ডলা। প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ঘরে উঠলো। দরজা খোলাই ছিলো ও আসবে বলে। বন্ধ করার জন্যে পেছন ফিরলো কপালকুণ্ডলা। প্রাঙ্গণের দিকে মুখ এখন ওর। হঠাৎ মনে হলো, উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী এক পুরুষ। ঠিক এই সময় বিদ্যুৎ চমকালো একবার। মুহূর্তের জন্যে চোখ ঝলসানো আলোয় ভরে গেল চারদিক। লোকটাকে চিনতে পারলো কপালকুণ্ডলা। সাগরতীরের সেই কাপালিক।

তিন

স্বপ্নে

দরজা বন্ধ করলো কপালকুণ্ডলা। ধীরপায়ে শোয়ার ঘরে এলো। নিঃশব্দে শুয়ে পড়লো পালঙ্কে। মানুষের মন অনন্ত সাগরের মতো। প্রচণ্ড বাতাস যখন তার ওপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকে, কে তার ঢেউ গুণতে পারে? কপালকুণ্ডলার মনে যে ঢেউরাশি বিক্ষুব্ধ হয়ে চলেছে কে তা গুণবে?

মনের দুঃখে শোয়ার ঘরে আসেনি নবকুমার। একা একা শুয়ে আছে কপালকুণ্ডলা। ঘুম আসছে না। বার বার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে বৃষ্টিভেজা জটাজুটধারী সেই মূর্তি, প্রবল বাতাসে বার বার দুলে দুলে উঠছিল তার জটা।

আগের সব ঘটনা মনে মনে আলোচনা করে দেখলো কপালকুণ্ডলা। কাপালিকের সাথে যে আচরণ করে ও চলে এসেছে তা মনে পড়লো। গভীর বনের ভেতর যে সব পৈশাচিক কাজ করতো কাপালিক তা স্মরণ হলো। ওর করা ভৈরবী পূজা, নবকুমারের বন্ধন, সব মনে পড়তে লাগলো এক এক করে। শিউরে উঠলো ও। আজ রাতের সব ঘটনাও ভেসে উঠলো মনের পর্দায়। শ্যামার ওষধির আকাঙ্ক্ষা, নবকুমারের নিষেধ, তার সঙ্গে ওর দুর্ব্যবহার, তারপরে অরণ্যের জ্যোৎস্নাভেজা সৌন্দর্য, গভীর বনের ভেতর আলো, কুটির, দুই লোকের কথাবার্তা, ছদ্মবেশী যুবক, তার অসাধারণ রূপ—সবই মনে পড়তে লাগলো।

পুব আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। এতক্ষণে একটু তন্দ্রামতো এলো কপালকুণ্ডলার। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল স্বপ্নের রাজ্যে। নৌকায় চড়ে সাগরপাড়ি দিচ্ছে ও। সুন্দর সাজানো নৌকা। বসন্ত রঙের পতাকা উড়ছে তাতে। ফুলের মালা গলায় দিয়ে বাইছে মাঝিরা। রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান তাদের গলায়। পশ্চিম আকাশ থেকে সোনা ঝরিয়ে চলেছে সূর্য। সোনার বৃষ্টি পেয়ে হাসছে সমুদ্র। আকাশে মেঘের দল ছুটাছুটি করে স্নান করছে সেই সোনার বৃষ্টিতে।

হঠাৎ রাত্রি হলো। কোথায় যেন ঢাকা পড়ে গেল সূর্য। সোনারঙা মেঘগুলো হারিয়ে গেল কোথায়। ঘন কালো মেঘ ছেয়ে ফেললো আকাশ। চারদিকে অথৈ সাগর, দিক ঠিক করার কোনো উপায় নেই। নৌকা ঘোরালো মাঝিরা। কিন্তু ঠিক করতে পারলো না কোন্ দিকে বাইবে। গান বন্ধ করলো তারা। ছিঁড়ে ফেললো গলার মালাগুলো। আপনা থেকেই খসে জলে পড়ে গেল বসন্ত রঙের পতাকাখানি। বাতাস উঠলো। পাহাড়ের সমান বিশাল একেকটা ঢেউ এগিয়ে আসছে নৌকার দিকে। হঠাৎ সেই ঢেউয়ের ভেতর থেকে মাথা উঁচু করলো প্রকাণ্ড এক জটাজুটধারী পুরুষ। বাঁ হাতে তুলে নিলো কপালকুণ্ডলার নৌকা। এইবার ডুবিয়ে দেবে সাগরের গভীরে। এমন সময় সেই ব্রাহ্মণবেশী অপূর্ব সুন্দর যুবক এসে ধরলো নৌকা।

'তোমায় রাখবো, না ডোবাবো?' জিজ্ঞেস করলো সে।

প্রথমে কিছু বলতে পারলো না কপালকুণ্ডলা। তারপর হঠাৎই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'ডোবাও।'

নৌকা ছেড়ে দিলো ব্রাহ্মণবেশী। তখন নৌকাও শব্দময়ী হয়ে উঠলো। বললো, 'আমি আর এ ভার বইতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি।' বলতে বলতে কপালকুণ্ডলাকে পানিতে ছুঁড়ে দিয়ে সাগরে ডুব দিলো নৌকা।

ঘুম ভেঙে গেল কপালকুণ্ডলার। ঘেমে-নেয়ে একাকার হয়ে গেছে ও। চোখ মেলে দেখলো, ভোর হয়ে এসেছে। জানালা খোলা, তার ভেতর দিয়ে মৃদু বাতাস ঢুকছে ঘরে। বাইরে গাছপালার শাখাপল্লব মৃদু দুলছে সে বাতাসে। পাখির দল ব্যাকুল হয়ে কূজন করছে।

উঠে বসলো কপালকুণ্ডলা। জানালার দিকে তাকালো। কতকগুলো সুন্দর বুনো লতা এলোমেলোভাবে দুলছে সেখানে। খাট থেকে নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ও। এলোমেলো লতাগুলো সাজিয়ে দিতে লাগলো জানালার ওপর। হঠাৎ একটা চিঠি বের হলো সেগুলোর ভেতর থেকে।

কপালকুণ্ডলা অধিকারীর ছাত্র; পড়তে জানে। চিঠি খুলে পড়লো—

'আজ সন্ধ্যার পর কাল রাতের ব্রাহ্মণকুমারের সাথে দেখা করবে। তোমার নিজের সম্পর্কে নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে কথা শুনতে চেয়েছিলে, তা শুনবে।

আমি ব্রাহ্মণবেশী।'

চার

কৃতসঙ্কেতে

সারাদিন ভাবনা চিন্তায় কাটলো কপালকুণ্ডলার। বুঝতে পারছে না, ব্রাহ্মণবেশীর সাথে দেখা করা ঠিক হবে কিনা। স্বামীভক্ত যুবতীর পক্ষে রাতে নির্জনে অপরিচিত পুরুষের সাথে দেখা করা উচিত নয়, এই কথা ভেবে ওর মনে দ্বিধা জেগেছে তা নয়। এ বিষয়ে ওর সিদ্ধান্ত পরিষ্কার দেখা করার উদ্দেশ্য খারাপ না হলে এমন সাক্ষাতে দোষ নেই। পুরুষে পুরুষে বা নারীতে নারীতে যেমন দেখা করার অধিকার, নারী পুরুষের সাক্ষাতেও দুজনেরই তেমন অধিকার থাকা উচিত বলে তার ধারণা। তাছাড়া, ব্রাহ্ম শী পুরুষ কিনা তাতেই সন্দেহ আছে। সুতরাং সে বিষয়ে ভাবনা নেই ওর। দেখা করে বিপদে পড়তে হবে কিনা তা নিয়েই ভাবছে ও।

প্রথমে ব্রাহ্মণবেশীর কথাবার্তা, পরে কাপালিকের দেখা পাওয়া, তারপরে স্বপ্ন; সব মিলিয়ে কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে কপালকুণ্ডলার, বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তা না হলে কথা নেই বার্তা নেই সেই কাপালিক এসে হাজির হবে কেন এখানে? এই ব্রাহ্মণবেশী মনে হয় তার সহচর। সুতরাং তার সাথে দেখা করায়ও বিপদের সম্ভাবনা আছে। সে তো স্পষ্টই বলেছে, কপালকুণ্ডলা সম্পর্কেই পরামর্শ হচ্ছিলো। ব্রাহ্মণকুমার যার সাথে আলাপ করছিলো সে সম্ভবত কাপালিক। সেই আলাপে কোনো একজনের মৃত্যুর সংকল্প প্রকাশ পাচ্ছিলো—অন্তত পক্ষে চিরনির্বাসনের। কার? ব্রাহ্মণবেশী তো স্পষ্টই বলেছে, কপালকুণ্ডলা সম্পর্কেই ষড়যন্ত্র হচ্ছিলো। তারমানে ওরই মৃ বা চিরনির্বাসন কল্পনা হচ্ছিলো। হলোই বা! তারপর স্বপ্ন, ওই স্বপ্নের তাৎপর্য কি? স্বপ্নে চরম দুঃসময়ে ওকে রক্ষা করতে চেয়েছিলো ব্রাহ্মণবেশী, কাজেও তা-ই ফলছে। সব কথা খুলে বলতে চাইছে ব্রাহ্মণকুমার।

স্বপ্নে কপালকুণ্ডলা বলেছে, 'ডোবাও।' বাস্তবেও কি সেরকমই বলবে?

না—না—ওকে বাঁচানোর জন্যে স্বপ্নে উপদেশ দিয়েছেন দয়াময়ী ভাবনী। ব্রাহ্মণবেশী এসে উদ্ধার করতে চাইছে ওকে। তার সাহায্য না নিলে ডুবে যাবে। অতএব দেখা করাই ঠিক হবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবনা চিন্তার ইতি টানলো কপালকুণ্ডলা।

অস্থিরতার ভেতর কেটে গেল দিনটা। সন্ধ্যার পর কোনো রকমে ঘরের কাজ শেষ করে বনের পথে রওনা হলো ও। যাওয়ার আগে শোয়ার ঘরের প্রদীপটা উজ্জ্বল করে রেখে গেল। কিন্তু যেই ও ঘর ছেড়ে বের হলো অমনি নিবে গেল

প্রদীপ।

দ্রুতপায়ে বনের দিকে হেঁটে চলেছে কপালকুণ্ডলা। হঠাৎ খেয়াল হলো, কোথায় দেখা করবে ব্রাহ্মণবেশীর সাথে তা ভুলে গেছে। চিঠিতে লেখা ছিলো, এখন মনে আসছে না কিছুতেই। চিঠিটা আবার পড়ে দেখা দরকার।

ঘরে ফিরে এলো কপালকুণ্ডলা। সকালে যেখানে চিঠি রেখেছিলো সেখানে খুঁজে দেখলো। কিন্তু পেলো না চিঠি। মনে পড়লো, চুল বাঁধার সময় খোপার ভেতর রেখেছিলো, যেন সব সময় সেটা সঙ্গে থাকে। খোপার ভেতর আঙুল চালিয়ে খুঁজলো। আঙুলে ঠেকলো না চিঠি। খোপা খুলে ফেললো। পাওয়া গেল না তবু। ঘরের যেখানে যেখানে রাখা সম্ভব সব জায়গায় খুঁজলো। কিন্তু নেই চিঠিটা। বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন। শেষে, কাল যেখানে দেখা হয়েছিলো, আজও সেখানেই দেখা হতে পারে; ভেবে আবার রওনা হলো ও। চুল বাঁধার কথা আর মনে নেই। অবিবাহিতা মেয়ের মতো এলোচুলে হেঁটে চললো কপালকুণ্ডলা বনপথ ধরে।

পাঁচ

গৃহদ্বারে

সন্ধ্যায় যখন ঘরের কাজ করছিলো কপালকুণ্ডলা, তখন খোপার ভেতর থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো চিঠি। খেয়াল করেনি ও। নবকুমার দেখেছিলো। খোপার ভেতর থেকে চিঠি খসে পড়লো দেখে বিস্মিত হলো নবকুমার, কৌতূহলীও। একটু পরে কপালকুণ্ডলা অন্যদিকে যেতেই চিঠিটা তুলে নিয়ে বাইরে চলে এলো নবকুমার। পড়ে দেখলো। ওই চিঠি পড়ে একটাই সিদ্ধান্ত করা সম্ভব। নবকুমারও তা-ই করলো। 'যে কথা কাল শুনতে চেয়েছিলে, সেকথা শুনবে।' কী সে কথা? প্রেমের কথা? ব্রাহ্মণবেশী মৃণ্ময়ীর প্রেমিক? যে আগের রাতের কথা জানে না, তার পক্ষে আর কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

চিতার আগুন যেভাবে জ্বলতে শুরু করে—প্রথমে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করা ধোঁয়া, তারপর কাঠে আগুন, তারপর একে একে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বলে ওঠা—চিঠি পড়ে তেমন অবস্থা হলো নবকুমারের। প্রথমে ভালো বুঝতে পারলো না, পরে সন্দেহ, তারপর নিশ্চিত ধারণা, শেষে জ্বালা। মানুষের মন বেশি কষ্ট বা বেশি সুখ একবারে অনুভব করতে পারে না, ধীরে ধীরে অনুভব করে। প্রথমে ধোঁয়া আচ্ছন্ন করলো নবকুমারকে; পরে আগুনের শিখায় উত্তপ্ত হলো মন; শেষে দাউ দাউ আগুনে পুড়তে লাগলো হৃদয়। আগে দু'একবার খেয়াল করেছে, কোনো কোনো বিষয়ে ওর অবাধ্য কপালকুণ্ডলা। বিশেষ করে নিষেধ সত্ত্বেও যেখানে খুশি সেখানে একা একা যায়, যার তার সাথে ইচ্ছা মতো আচরণ করে, তাছাড়া ওর নিষেধ অমান্য করে একা একা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। আর কেউ হলে এতেই সন্দিহান হতো। কিন্তু নবকুমার কখনও সন্দেহ করেনি কপালকুণ্ডলাকে। সন্দেহ করলে ওর

নিজের জীবনই যে দুঃসহ হয়ে উঠবে। নিছক সন্দেহ হলে আজও তা দূর করতে পারতো। কিন্তু আজ সন্দেহ নয়, বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে ওর মনে।

যন্ত্রণার প্রথম বেগটা থিতিয়ে এলো ধীরে ধীরে। নীরবে বসে অনেকক্ষণ কাঁদলো নবকুমার। একটু শান্ত হলো মনটা। কি করবে ঠিক করে ফেললো মনে মনে। আজ কিছু বলবে না কপালকুণ্ডলাকে। সন্ধ্যায় যখন বনে যাবে তখন গোপনে অনুসরণ করবে ওকে; ওর মহাপাপ নিজ চোখে দেখবে, তারপর বিসর্জন দেবে এই তুচ্ছ জীবন। কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলবে না, নিজের প্রাণ বিনষ্ট করবে। না করে কি করবে?—জীবনের এই দুর্বহ ভার বইবার শক্তি তার হবে না।

মনে মনে প্রস্তুত হয়ে বাড়ির খিড়কী দরজার দিকে লক্ষ রাখতে লাগলো নবকুমার—কখন বনের পথে রওনা হয় কপালকুণ্ডলা।

সন্ধ্যার পরপরই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল কপালকুণ্ডলা। চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলো নবকুমার। কপালকুণ্ডলা কিছুদূর যাওয়ার পর বেরোলো সে-ও। তারপরই খেয়াল করলো ফিরে আসছে কপালকুণ্ডলা। তাড়াতাড়ি আড়ালে সরে এলো নবকুমার।

ঘরে গিয়ে ঢুকলো কপালকুণ্ডলা। একটু পরেই বেরিয়ে এলো আবার। খিড়কীর পথ ধরে এগিয়ে চললো বনের দিকে। পেছন পেছন যাওয়ার জন্যে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে যাবে নবকুমার, এমন সময় দেখলো, সামনে ওর পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘকায় এক পুরুষ।

কে লোকটা, কেন এমন পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, জানার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হলো না নবকুমারের। ভালো করে তাকালোও না লোকটার দিকে। কপালকুণ্ডলার দিকে দৃষ্টি রাখতেই ব্যস্ত ওর চোখ। পথ মুক্ত করার জন্যে আনমনে আগন্তুকের বুকে হাত দিয়ে একটা ঠেলা দিলো, কিন্তু সরাতে পারলো না তাকে।

অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো নবকুমার।

'কে তুমি?' বললো ও। 'দূর হও—আমার পথ ছাড়ো।'

আগন্তুক বললো, 'কে আমি, তুমি চেনো না?'

সাগর গর্জনের মতো নবকুমারের কানে লাগলো শব্দটা। এতক্ষণে চোখ ফেরালো ও। সাগরতীরের সেই জটাজুটধারী কাপালিককে দেখে চমকে উঠলো ও। কিন্তু ভয় পেলো না। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো নবকুমারের মুখ।

'কপালকুণ্ডলা কি তোমার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে,' জিজ্ঞেস করলো ও।

'না,' বললো কাপালিক।

জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল আশার প্রদীপ। আবার আগের মতো আঁধার হয়ে গেল নবকুমারের মুখ। 'তাহলে তুমি পথ ছাড়ো,' বললো ও।

'ছাড়ছি, কিন্তু তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে—আগে শোনো।'

'আমার সাথে আবার কি কথা তোমার? আমাকে হত্যা করতে এসেছো? করো, এবার আর কোনো বাধা দেবো না। একটু অপেক্ষা করো, আমি আসছি। উহ্, কেন আমি তখন দেবতুষ্টির জন্যে শরীর দিলাম না? এখন তার ফলভোগ করছি। যে আমাকে বাঁচিয়েছিলো সেই-ই আমাকে নষ্ট করলো! কাপালিক! এবার

আর অবিশ্বাস কোরো না আমাকে। একটু অপেক্ষা করো। এখনই এসে তোমার হাতে তুলে দেবো আমার প্রাণ।'

'আমি তোমার প্রাণ নিতে আসিনি,' বললো কাপালিক। 'ভবানীর তা ইচ্ছে নয়। আমি যা করতে এসেছি তা তোমার মনঃপুত হবে। বাড়ির ভেতর চলো, আমি যা বলি, শোনো।'

'এখন না, অন্য সময় শুনবো। তুমি একটু অপেক্ষা করো, বিশেষ একটা কাজ আছে আমার, শেষ করেই আসছি।'

'বৎস! আমি সবই জানি। তুমি সেই পাপিষ্ঠার অনুসরণ করবে তো? ও কোথায় যাবে তা আমি জানি। আমি নিজে তোমাকে নিয়ে যাবো সেখানে, যা দেখতে চাও দেখাবো। এখন আমার কথা শোনো, ভয় পেয়ো না।'

'তোমাকে আর কোনো ভয় নেই আমার। এসো।'

কাপালিককে ঘরের ভেতর নিয়ে এলো নবকুমার। আসন এগিয়ে দিলো বসবার জন্যে। নিজেও বসলো। তারপর বললো, 'বলো।'

ছয়

পুনরালাপে

আসনে বসে কাপালিক দুই বাহু উঁচু করে দেখালো। আশ্চর্য হয়ে দেখলো নবকুমার, দুটো বাহুই ভাঙা।

যে রাতে কপালকুণ্ডলার সাথে সমুদ্রতীর থেকে পালায় নবকুমার, সে রাতে ওদের খুঁজতে খুঁজতে বালিয়াড়ির চূড়া থেকে পড়ে যায় কাপালিক, পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে সে কথা। পড়ার সময় দুই হাত মাটিতে ঠেকিয়ে শরীর বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলো সে। তাতে শরীর বেঁচেছিলো বটে, কিন্তু ভেঙে যায় হাতদুটো। নবকুমারকে সব কথা খুলে বললো কাপালিক। শেষে যোগ করলো, 'দৈনন্দিন কাজগুলো করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না এই বাহু দিয়ে। কিন্তু এতে আর বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। এমন কি, কাঠ সংগ্রহ করতেও কষ্ট হয়।'

একটু থামলো কাপালিক। তারপর আবার শুরু করলো, 'আমার হাতদুটো ভেঙেছে কিন্তু শরীর সম্পূর্ণ সচল, শক্তিশালী। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে তা টের পেয়েছিলাম এমন নয়। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়েছিলাম। কয় দিন যে ঐ অবস্থায় ছিলাম বলতে পারবো না। দুই রাত একদিন হবে বোধ হয়। ভোর বেলায় আবার জ্ঞান ফিরে পেলাম পুরোপুরি। তার ঠিক আগেই একটা স্বপ্ন দেখছিলাম আমি! যেন ভবানী—,' বলতে বলতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো কাপালিকের শরীর। 'যেন ভবানী স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন আমার সামনে। ভ্রূকুটি করে আমায় বকছেন। বলছেন, ''রে দুরাচার, তোরই চিত্তের অশুদ্ধির কারণে আমার পূজায় এ বাধা এসেছে। এতদিন ইন্দ্রিয়ের লালসায় অন্ধ হয়ে তুই এই কুমারীর রক্তে আমার পূজা করিসনি। অতএব এই কুমারী হতেই তোর আগের সব সাধনার ফল নষ্ট হলো।

আমি তোর পূজা আর কখনও গ্রহণ করবো না।''

'তখন আমি কেঁদে লুটিয়ে পড়লাম মায়ের চরণে। প্রসন্ন হলেন মা। বললেন, ''বৎস! ঠিক আছে, প্রায়শ্চিত্ত করলে আবার তোমার পূজা আমি গ্রহণ করবো।''

'আমি কেঁদে জিজ্ঞেস করলাম, ''কি প্রায়শ্চিত্ত, মা?''

'জননী উত্তর দিলেন, ''সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার কাছে বলি দেবে। যতদিন না পারো, আমার পূজা কোরো না।''

'কত দিনে বা কিভাবে আমি ভালো হলাম বলার কোনো প্রয়োজন নেই। সুস্থ হয়ে আমি দেবীর আজ্ঞা পালনের চেষ্টা শুরু করলাম। কিন্তু তখন হাতদুটোয় শিশুর শক্তিও নেই। শক্তি ছাড়া চেষ্টা সফল হবে না। সুতরাং একজন সহকারীর দরকার হলো। কিন্তু সহকারী তো আর চাইলেই পাওয়া যায় না—ধর্মকর্মে বিশেষ মন নেই আজকালকার মানুষের। তাছাড়া কলির প্রভাবে দেশের রাজা বিধর্মী। রাজরোষে পড়ার ভয়েই কেউ এমন কাজের সাথী হতে রাজি হয় না।

'বহু খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারলাম, পাপিষ্ঠা কোথায় থাকে। কিন্তু পঙ্গু হাত দুটোর শক্তির অভাবে ভবানীর নির্দেশ পালন করতে পারিনি। মনস্কামনা সফল করার জন্যে তন্ত্রের বিধান অনুসারে ক্রিয়া কর্ম করে থাকি কেবল। কাল রাতেও হোম করছিলাম ঐ বনের ভেতর. সেই সময় নিজের চোখে দেখলাম. এক ব্রাহ্মণকুমারের মিলন হলো কপালকুণ্ডলার সাথে। আজও ও দেখা করতে যাচ্ছে তার সাথে। দেখতে চাও? আমার সাথে এসো, দেখাবো।'

থামলো কাপালিক। নবকুমার মূর্তির মতো বসে আছে দেখে আবার শুরু করলো কাপালিক, 'বৎস! কপালকুণ্ডলাকে হত্যা করা যায়। কোনো দোষ হবে না তাতে—ভবানীর নির্দেশে ওকে হত্যা করবো আমি।' একটু ইতস্তত করলো কাপালিক। তারপর বললো, 'তোমার বিশ্বাসকে হত্যা করেছে ও—তুমিও ওকে হত্যা করতে পারো। তুমি সাহায্য করবে আমাকে? এই অবিশ্বাসিনীকে ধরে আমার সাথে যজ্ঞের জায়গায় নিয়ে চলো। নিজ হাতে বলি দাও একে। ঈশ্বরীর কাছে যে অপরাধ করেছো, তা থেকে মাফ পাবে, পবিত্র কাজে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হবে, বিশ্বাসঘাতিনীর শাস্তি হবে, প্রতিশোধ নেওয়াও হবে।'

থামলো কাপালিক। কোনো জবাব দিলো না নবকুমার। ঘেমে নেয়ে উঠেছে ও। ওকে নীরব দেখে কাপালিক আবার বললো, 'বৎস! যা দেখাবো বলেছিলাম, তা দেখবে চলো।'

ঘর্মাক্ত দেহে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো নবকুমার। রওনা হলো কাপালিকের সঙ্গে।

সাত

সপত্নীসম্ভাষে

দ্বিতীয়বার ঘর থেকে বেরিয়ে বনে ঢুকেছে কপালকুণ্ডলা। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছুলো

কালকের সেই ভাঙাবাড়ির কাছে। ব্রাহ্মণবেশীকে পেলো সেখানে। যদি দিন হতো, তাহলে দেখতে পেতো, তার মুখ আজ মলিন। ওকে দেখে ব্যস্ত হলো ব্রাহ্মণবেশী।

'যে কোনো মুহূর্তে কাপালিক এসে পড়তে পারে,' বললো সে। 'এখানে আলাপ করা ঠিক হবে না। অন্য জায়গায় চলো।'

পড়ো বাড়ি থেকে সামান্য দূরে ফাঁকা একটা জায়গা। চারপাশে গাছপালা, মাঝখানে ফাঁকা। একটা পথ বেরিয়ে গেছে সেখান থেকে। ব্রাহ্মণবেশীর সাথে সেখানে গেল কপালকুণ্ডলা। বসলো দুজনে।

'প্রথমে নিজের পরিচয় দিই,' বললো ব্রাহ্মণকুমার। 'আমার কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য নিজেই বুঝতে পারবে। স্বামীর সঙ্গে যখন তুমি হিজলী প্রদেশ থেকে আসছিলে, তখন পথে এক মুসলমান কন্যার সাথে দেখা হয়েছিলো, মনে পড়ে তোমার?'

'যিনি আমাকে অলঙ্কার দিয়েছিলেন?' কপালকুণ্ডলার প্রশ্ন।

'আমিই সেই।'

খুবই অবাক হলো কপালকুণ্ডলা। লুৎফ্-উন্নিসা ওর বিস্ময় দেখে বললো, 'আরো অবাক হওয়ার বিষয় আছে—আমি তোমার সতীন।'

সত্যিই এবার আর মুখ দিয়ে কথা সরলো না কপালকুণ্ডলার। অস্ফুট গলায় কোনোরকমে বললো, 'সে কি?'

নিজের জীবনইতিহাস এবার মেলে ধরলো লুৎফ্-উন্নিসা কপালকুণ্ডলার সামনে। বিয়ে, জাত খোয়ানো, স্বামীর ওকে ছেড়ে যাওয়া, ঢাকা, আগ্রা, জাহাঁগীর, মেহের-উন্নিসা, আগ্রা ছেড়ে আসা, সপ্তগ্রামে বাস, নবকুমারের সাথে সাক্ষাৎ, নবকুমারের ব্যবহার, গত সন্ধ্যায় ছদ্মবেশে বনে আসা, হোমকারীর সাথে সাক্ষাৎ, সব বললো।

'তুমি কি উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে আমাদের বাড়িতে আসতে চেয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করলো কপালকুণ্ডলা।

'তোমার সাথে স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মানোর উদ্দেশ্যে।'

চিন্তা করতে লাগলো কপালকুণ্ডলা। একটু পরে বললো, 'কি করে সম্ভব করতে তা?'

'আপাতত তোমার সতীত্বের প্রতি সন্দেহ জন্মে দিতাম স্বামীর মনে···। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি, সে বুদ্ধি তো বাদ দিয়েছি। এখন যদি তুমি আমার পরামর্শ মতো কাজ করো, তবে তোমাকে দিয়েই আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে—তোমারও মঙ্গল হবে।'

'হোমকারীর মুখে তুমি কার নাম শুনেছিলে?'

'তোমারই। তিনি তোমার মঙ্গল কামনায় না অমঙ্গল কামনায় হোম করেন, তা জানার জন্যে প্রণাম করে তাঁর কাছে বসলাম। হোম শেষে তোমার নাম যোগ করে হোমের উদ্দেশ্য কি, জিজ্ঞেস করলাম। সামান্য একটু আলাপ করেই বুঝতে পারলাম, তোমার অমঙ্গলই তাঁর হোমের উদ্দেশ্য। আমারও এক উদ্দেশ্য। তাঁকে জানালামও সে কথা। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁদে পড়ে গেলাম। বিশেষ পরামর্শের জন্যে

আমাকে ঐ ভাঙাবাড়িতে নিয়ে গেলেন তিনি। তারপর জানালেন তাঁর ইচ্ছা। তোমার মৃত্যুই তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় তা। সন্দেহ নেই, সারাজীবন কেবল পাপই করেছি; তাই বলে পাপের পথে আমার এতদূর অধঃপতন হয়নি যে নিরপরাধ একটা মেয়ের হত্যায় সহায়তা করবো। আমি সম্মতি দিলাম না কাপালিকের কথায়। এই সময় তুমি ওখানে উপস্থিত হয়েছিলে। বোধহয় শুনেছ দু'একটা কথা।'

'হ্যাঁ, আমি ওরকম আলাপই শুনেছিলাম।'

'আমাকে অবোধ অজ্ঞান ভেবে কিছু উপদেশ দিতে চাইলেন হোমকারী। শেষটা কি দাঁড়ায় তা জেনে তোমাকে উচিত সংবাদ দেবো বলে তোমাকে বনের ভেতর রেখে গেছিলাম।'

'তারপর আর ফিরে এলে না কেন?'

'মেলা বকবক করলেন উনি, শুনতে শুনতে দেরি হয়ে গেল। লোকটাকে ভালো করেই চেনো তুমি। কে সে, অনুমান করতে পারছো?'

'যার কাছে আমি বড় হয়েছি, সেই কাপালিক?'

'হ্যাঁ। সাগরতীরে তোমাকে পাওয়া থেকে শুরু করে সব বললেন তিনি। তোমার বড় হওয়া, নবকুমার এলো, তার সাথে পালালে তুমি—সব। তোমরা পালানোর পর যা যা ঘটেছিলো তা-ও বললেন। সে সব তুমি জানো না। বলছি শোনো—।'

এরপর বালিয়াড়ির চূড়া থেকে কাপালিকের পড়ে যাওয়া, হাত ভাঙা, স্বপ্ন—সব বললো লুৎফ্-উন্নিসা। মা ভবানীর স্বপ্নাদেশের বর্ণনা শুনে চমকে শিউরে উঠলো কপালকুণ্ডলা। চঞ্চল হয়ে উঠলো মনে মনে।

'কাপালিকের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ভবীনীর নির্দেশ পালন করবেন,' বলে যেতে লাগলো লুৎফ্-উন্নিসা। 'হাতে শক্তি নেই, এজন্যে অন্যের সাহায্য খুবই দরকার তাঁর। আমাকে ব্রাহ্মণের ছেলে ভেবে সহকারী হিসেবে পাওয়ার আশায় সব বলেছেন। এখনো রাজি হইনি আমি। মনের গতির কথা বলতে পারি না—কখন লোভে পড়ি, কিন্তু আশা করি কখনোই রাজি হবো না। বরং বিরোধিতাই করবো। এ-ই আমার ইচ্ছা, সেজন্যেই তোমাকে এত কথা বললাম।'

একটু থামলো লুৎফ্-উন্নিসা। তারপর বললো, 'কিন্তু ভেবো না নিঃস্বার্থ হয়ে এই কাজ করছি আমি। তোমার প্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছি। বিনিময়ে তুমি আমার জন্যে কিছু করো।'

'কি করবো?'

'আমারও প্রাণ ফিরিয়ে দাও—স্বামী ত্যাগ করো।'

অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলো না কপালকুণ্ডলা। তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'স্বামীকে ছেড়ে কোথায় যাবো?'

'বিদেশে—বহুদূরে—তোমাকে বাড়ি দেবো, টাকা দেবো—অনেক টাকা, দাসদাসী দেবো। রাণীর মতো থাকবে।'

আবার চিন্তা করতে লাগলো কপালকুণ্ডলা। মনের চোখ দিয়ে সারা পৃথিবীটা

দেখলো—কোথাও কাউকে দেখতে পেলো না। অন্তরের ভেতর তাকিয়ে দেখলো—সেখানে তো দেখতে পাচ্ছে না নবকুমারকে! তাহলে কেন লুৎফ্-উন্নিসার সুখের পথে কাঁটা হবে?

'তুমি আমার উপকার করছো কিনা এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না,' লুৎফ্-উন্নিসার দিকে তাকিয়ে বললো কপালকুণ্ডলা। 'বাড়ি, টাকা, সম্পত্তি, দাস-দাসীর দরকার নেই। আমি তোমার সুখের পথে কেন বাধা হবো? তোমার ইচ্ছে সফল হোক—কাল থেকে আর কোনো বাধা থাকবে না তোমার সামনে। আমি বনচর ছিলাম আবার বনচর হবো।'

অবাক হলো লুৎফ্-উন্নিসা। এত সহজে রাজি হবে কপালকুণ্ডলা ভাবেনি।

'বোন! তুমি দীর্ঘায়ু হও,' মুগ্ধ গলায় বললো ও, 'নতুন জীবন দিলে তুমি আমাকে। কিন্তু অমন সহায়সম্বলহীন হয়ে তোমাকে যেতে দেবো না আমি। কাল ভোরে আমার এক বিশ্বাসী দাসীকে পাঠাবো তোমার কাছে। তার সাথে যেও। বর্ধমানের অত্যন্ত প্রভাবশালী এক মহিলা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রয়োজনীয় সব জিনিস তার কাছে পাবে তুমি।'

কথাবার্তায় এমন মগ্ন হয়ে আছে লুৎফ্-উন্নিসা আর কপালকুণ্ডলা যে, আশপাশে কোনোদিকে দৃষ্টি বা মন নেই তাদের। যে সরু বুনোপথ ফাঁকা জায়গাটা থেকে বেরিয়ে গেছে, তার এক প্রান্তে যে দাঁড়িয়ে আছে কাপালিক আর নবকুমার, ক্রূর দৃষ্টিতে যে দেখছে ওদেরকে তার কিছুই টের পায়নি ওরা।

নবকুমার আর কাপালিক এতটা দূরে দাঁড়িয়ে যে, ওদের দেখতে পাচ্ছে শুধু, কথাবার্তা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। মানুষের চোখ কান যদি সমান দূরে যেতে পারতো, তাহলে মানুষের দুঃখ কমতো কি বাড়তো, কে বলবে?

নবকুমার দেখলো, এলোচুলে বসে আছে কপালকুণ্ডলা। কপালকুণ্ডলা যখন ওর হয়নি, তখনও সে চুল বাঁধতো না। আবার দেখলো, সেই খোলাচুলের রাশি অসাবধানে এসে ব্রাহ্মণকুমারের পিঠের ওপর পড়েছে। দুজনের চুল একাকার হয়ে গেছে। কপালকুণ্ডলার মাথায় এত চুল, আর নিচু স্বরে কথা বলার জন্যে দুজনে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে যে, লুৎফ্-উন্নিসার পিঠেও ছড়িয়ে পড়েছে ওর চুল। দুজনের কেউই খেয়াল করেনি তা। কিন্তু নবকুমার করলো। ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়লো সে।

নিজের কোমর থেকে একটা নারকেলপাত্র খুলে নিলো কাপালিক। বৎস!' বললো সে, 'বল হারিয়েছ; এই মহৌষধ পান করো—ভবানীর প্রসাদ। পান করে বল পাবে।'

নবকুমারের মুখের কাছে পাত্র ধরলো কাপালিক। আনমনে অনেকখানি খেয়ে নিলো নবকুমার। দারুণ তৃষ্ণার শান্তি হলো যেন। ও জানে না এই সুস্বাদু পানীয় আর কিছু নয়, কাপালিকের নিজহাতে তৈরি প্রচণ্ড কড়া মদ। পান করা মাত্র সবল হয়ে উঠলো ও

এদিকে লুৎফ-উন্নিসা আগের মতোই মৃদুস্বরে কথা বলছে কপালকুণ্ডলার সাথে।

'বোন! তুমি যে কাজ করলে, তার প্রতিদান দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তবু যদি আমি চিরদিন তোমার মনে থাকি, সে-ও আমার সুখ। যে অলঙ্কারগুলো দিয়েছিলাম, শুনেছি, তা তুমি ভিখিরিকে দিয়ে দিয়েছো। এখন সাথে কিছু নেই। কালকের অন্য দরকারের কথা ভেবে একটা আঙটি এনেছিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় সে পাপ কাজ আর করতে হলো না। আঙটিটা তুমি রাখো। ভবিষ্যতে এটা দেখলে এই মুসলমান বোনের কথা মনে পড়বে তোমার। আজ যদি স্বামী জিজ্ঞেস করেন, আঙটি কোথায় পেলে, বোলো, লুৎফ্-উন্নিসা দিয়েছে।'

আঙুল থেকে অনেক দাম দিয়ে কেনা একটা আঙটি খুলে কপালকুণ্ডলার হাতে দিলো লুৎফ্-উন্নিসা। দূর থেকে তা দেখে কাঁপতে শুরু করলো নবকুমার—রাগে, হতাশায় না উত্তেজনায় কে বলবে?

কাপালিক ধরে আছে নবকুমারকে। ও কাঁপতে শুরু করতেই আবার নারকেলের পাত্রটা এগিয়ে দিলো মুখের কাছে। কড়া মদ ঢুকেছে নবকুমারের মস্তিষ্কে। ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছে ওর স্বভাবের স্বাভাবিক গুণ। মায়া, মমতা, স্নেহের অঙ্কুর উপড়ে যেতে লাগলো।

লুৎফ্-উন্নিসার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলো কপালকুণ্ডলা। বনের আড়ালে আড়ালে থেকে অনুসরণ করে চললো নবকুমার আর কাপালিক।

আট

গৃহাভিমুখে

বাড়ির দিকে চলেছে কপালকুণ্ডলা। গভীর চিন্তায় ডুবে আছো ও। লুৎফ্-উন্নিসার সাথে আলাপের পর আমূল বদলে গেছে ওর ভেতরটা। আত্মবিসর্জনের জন্যে প্রস্তুত এখন ও। কিন্তু কি জন্যে আত্মবিসর্জন? লুৎফ্-উন্নিসার জন্যে? না।

মনের দিক থেকে কপালকুণ্ডলা তান্ত্রিকের সন্তান। তান্ত্রিক যেমন মা কালীর সন্তুষ্টির জন্যে অন্যের প্রাণ বলি দিতে পারে নিঃসংকোচে, কপালকুণ্ডলাও ঐ একই কারণে বলি দিতে পারে—তবে অন্যকে নয় নিজেকে। কপালকুণ্ডলা কাপালিকের মতো মন প্রাণ দিয়ে কালীর সন্তুষ্টি কামনা করে তা নয়, ছেলেবেলা থেকে কাপালিকের কালীভক্তি দেখে, শুনে এবং সাধনায় সহায়তা করে মোটামুটি একটা ভক্তি জন্মেছিলো ওর মনে। ভৈরবী যে সৃষ্টির শাসনকর্ত্রী, মুক্তিদাত্রী তাতে কোনো সংশয় নেই ওর। কালিকার পূজার জায়গা যে নররক্তে প্লাবিত হয় তা ওর কোমল হৃদয়ে সইতো না, এছাড়া আর কোনো কাজে ভক্তির ত্রুটি ছিলো না ওর। এখন সেই বিশ্বশাসনকর্ত্রী, মানুষের সুখ দুঃখের নির্ধারক ভৈরবী স্বপ্নে ওর জীবন সমর্পণের আদেশ করেছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন করবে না? ওর তো কোনো বন্ধন নেই। কোনোদিন ছিলো বলেও মনে পড়ে না। তাহলে আর দ্বিধা কি?

যার কোনো বাঁধন নেই সে-ই তো ছুটে চলে! পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝর্ণা

নেমে এলে, কে তার গতিরোধ করে? কপালকুণ্ডলার মন যে চঞ্চল হয়েছে, কে তাকে শান্ত করবে?

'কেনই বা এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না করবো?' নিজের মনকে জিজ্ঞেস করলো কপালকুণ্ডলা। 'পঞ্চভূতের তৈরি এ দেহ নিয়ে কি করবো?'

প্রশ্ন করলো বটে, কিন্তু নিশ্চিত কোনো জবাব পেলো না। সংসারে অন্য কোনো বন্ধন না থাকলেও পঞ্চভূতের এক বন্ধন আছে। সে বন্ধন ছেঁড়া কি এতই সহজ?

মাথা নিচু করে হেঁটে চলেছে কপালকুণ্ডলা। মানুষের মন যখন অসহনীয় কোনো ভাবে আচ্ছন্ন হয়, পৃথিবীর আর কিছুর দিকে লক্ষ থাকে না; তখন অপ্রাকৃতিক জিনিসও বাস্তব হয়ে দেখা দেয় সামনে। সেই অবস্থা হয়েছে কপালকুণ্ডলার।

হঠাৎ ওর মনে হলো, আকাশ থেকে কে যেন বলছে, 'বৎসে! আমি পথ দেখাচ্ছি।'

চমকে ওপর দিকে তাকালো ও। বর্ষার মেঘের মতো একটা মূর্তি যেন দেখতে পেলো। গলায় ঝোলানো খুলির মালা থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। কোমর ঘিরে দুলছে মানুষের কাটা হাত। বাঁ হাতে একটা মানুষের কাটা মুণ্ড। শরীরে রক্তের ধারা। কপালে তীব্র উজ্জ্বল দু'চোখের মাঝে নতুন বাঁকা চাঁদ। ডান হাত তুলে কপালকুণ্ডলাকে ডাকছেন যেন ভৈরবী।

আকাশের দিকে তাকিয়ে হেঁটে চলেছে কপালকুণ্ডলা। আকাশের সেই ভয়াল ভীষণ মূর্তি ওর আগে আগে চললো। কখনো মেঘের আড়ালে হারিয়ে যায় মূর্তিটা, কখনো স্পষ্ট ভেসে ওঠে দৃষ্টিপথে। দেখতে দেখতে চলেছে কপালকুণ্ডলা।

নবকুমার বা কাপালিক এসব কিছু দেখেনি। কপালকুণ্ডলার দিকে চোখ রেখে অনুসরণ করছে তারা। মদের বিষে আগুন জ্বলে উঠেছে নবকুমারের হৃদয়ে। অসহ্য লাগছে ওর কাছে কপালকুণ্ডলার ধীর পায়ে হেঁটে যাওয়া। সঙ্গীকে ডাকলো ও, 'কাপালিক!'

'কি?'

'আরো পানীয় দাও।'

আবার ওকে সুরা পান করালো কাপালিক।

'আর দেরি কেন?' জিজ্ঞেস করলো নবকুমার।

'আর দেরি কেন?' জিজ্ঞেস করলো কাপালিকও।

'কপালকুণ্ডলা!' তীব্র গম্ভীর স্বরে ডাকলো নবকুমার।

চমকে উঠলো কপালকুণ্ডলা। আজকাল কেউ ওকে কপালকুণ্ডলা বলে ডাকে না। মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো ও। ধীরে ধীরে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো নবকুমার আর কাপালিক। চাঁদের আবছা আলোয় হঠাৎ করে ওদের চিনতে পারলো না কপালকুণ্ডলা।

'তোমরা কে?' কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলো ও। 'যমদূত?'

পরমুহূর্তে চিনতে পারলো দুজনকেই। বলে উঠলো, 'না না, পিতা, তুমি কি

আমায় বলি দিতে এসেছো?'

দৃঢ়মুষ্টিতে কপালকুণ্ডলার হাত ধরলো নবকুমার।

'বৎসে।' করুণা মাখানো কোমল গলায় বললো কাপালিক, 'আমাদের সাথে এসো।' পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো সে পূজার জায়গার দিকে।

আকাশের পানে দৃষ্টি মেলে দিলো কপালকুণ্ডলা। যেখানে সেই গগন বিদারিণী ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখেছিলো তাকালো সেদিকে। ওর মনে হলো খলখল হাসছে রণরঙ্গিনী; দীর্ঘ এক ত্রিশূল হাতে ধরে কাপালিক যে পথে যাচ্ছে ইশারা করছে সেদিকে। একটা কথাও বলতে পারলো না কপালকুণ্ডলা। হতাশ, ক্লান্তভঙ্গিতে অনুসরণ করলো কাপালিকের। শক্তহাতে ওর হাত ধরে পাশে পাশে চললো নবকুমার।

নয়

প্রেতভূমে

চাঁদ ডুবে গেল। অন্ধকার নেমে এলো প্রকৃতিতে। কপালকুণ্ডলাকে পূজার জায়গায় নিয়ে এলো কাপালিক। নদীর পাড়ে বিশাল এক চরে জায়গাটা। তার ঠিক সামনে আরো বড় একটা বেলে চরা। ঐ চরে শ্মশান। জোয়ারের সময় দুই চরের মাঝখানে সামান্য জল থাকে, ভাটার সময় থাকে না। এখন ভাটা। ফলে দুটো চর এক হয়ে একটা চরে পরিণত হয়েছে।

শ্মশানের যে মুখ নদীর দিকে সেই মুখ অনেক উঁচু। ওপাশটা খাড়া নেমে গেছে নদীতে। জলে নামতে গেলে একেবারে চূড়া থেকে গভীর পানিতে পড়তে হয়। জলের তোড়ে ক্ষয়ে গেছে পাড়ের গোড়ার কিছুটা। মাঝে মাঝেই সেখান থেকে খসে পড়ে বড় বড় মাটির ঢেলা।

পূজার জায়গায় প্রদীপ নেই। কাঠের টুকরো জ্বালিয়ে আগুন তৈরি করা হয়েছে। অস্পষ্ট আলোতে শ্মশানটা আরো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। কাছেই পূজা, হোম, বলি প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধনার উপকরণ সাজানো। চারপাশে নিথর নীরব প্রকৃতি। নদীর মৃদু জলকল্লোলও শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক থেকে ভেসে আসছে শ্মশানের শবভুক পশুদের কর্কশ চিৎকার।

নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে নির্দিষ্ট জায়গায় কুশাসনে বসালো কাপালিক। তন্ত্রের বিধান অনুসারে শুরু করলো পূজা।

পূজার প্রথম পর্ব শেষ হলো।

'কপালকুণ্ডলাকে স্নান করিয়ে আনো,' নবকুমারকে আদেশ করলো কাপালিক।

কপালকুণ্ডলার হাত ধরে উঠে দাঁড়ালো নবকুমার। শ্মশানের ওপর দিয়ে নিয়ে চললো স্নান করানোর জন্যে। ছড়িয়ে থাকা হাড়ের টুকরো ফুটতে লাগলো ওদের পায়ে। নবকুমারের পায়ের আঘাতে ভেঙে গেল একটা জলভরা শ্মশান-কলস।

কলসটার পাশেই একটা শব পড়ে আছে—হতভাগার সৎকার করেনি কেউ। দুজনেরই পা লাগলো তাতে। কাপালকুণ্ডলা একটু ঘুরে এড়িয়ে গেল শবটা, নবকুমার মাড়িয়ে গেল সেটা। চারদিকে ঘুরছে শবভুক পশুর দল। আচমকা দুজন জীবিত মানুষের আবির্ভাবে তীব্রগলায় প্রতিবাদ করে উঠলো তারা। আক্রমণের ভঙ্গি করলো দু'একটা, ভয়ে পালালো কেউ কেউ। কপালকুণ্ডলা অনুভব করলো, হাত কাঁপছে নবকুমারের।

'ভয় পাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলো সে।

মদের ঘোর ক্রমে কেটে আসছে নবকুমারের। গম্ভীর গলায় উত্তর দিলো, 'ভয়, মৃন্ময়ী? না।'

'তা হলে কাঁপছো কেন?'

যে স্বরে প্রশ্নটা করলো কপালকুণ্ডলা, তা কেবল রমণীকণ্ঠেই সম্ভব। অন্যের দুঃখে যখন গলে যায় রমণীহৃদয়, কেবল তখনই রমণীকণ্ঠ হতে অমন স্বর বেরোতে পারে।

'ভয়ে নয়,' বললো নবকুমার, 'কাঁদতে পারছি না, এই রাগে কাঁপছি।'

'কাঁদবে কেন?'

আবার সেই সহানুভূতি ভরা কোমল কণ্ঠ!

নবকুমার বললো, 'কাঁদবো কেন? তুমি কি বুঝবে, মৃণ্ময়ী? তুমি তো কখনও রূপ দেখে উন্মত্ত হওনি—,' বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো নবকুমারের। 'তুমি—তুমি তো কখনও নিজের হৃৎপিণ্ড নিজে ছিঁড়ে শ্মশানে ফেলতে আসোনি···।' বলতে বলতে চিৎকার করে কেঁদে ফেললো নবকুমার। আছড়ে পড়লো কপালকুণ্ডলার পায়ে।

'মৃণ্ময়ী!—কপালকুণ্ডলা! আমাকে বাঁচাও। এই তোমার পায়ে পড়ছি, একবার বলো, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—শুধু একবার, আমি হৃদয়ে তুলে তোমাকে ঘরে নিয়ে যাই।'

একটু ঝুঁকে হাত ধরে নবকুমারকে ওঠালো কপালকুণ্ডলা। মৃদুস্বরে বললো, 'তুমি তো জিজ্ঞেস করোনি!'

যখন এই কথা হলো, তখন দুজনেই পাড়ের একেবারে কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। কপালকুণ্ডলা সামনে। নদীর দিকে পেছন ফিরে আছে। তার পেছনে, এক পা পরেই খাড়া ঢাল, অনেক নিচে গভীর জল। নদীতে জোয়ার আসতে শুরু করেছে। কপালকুণ্ডলার পায়ের নিচে একটা ফাটল। জলের তোড়ে চরের গোড়া ক্ষয়ে গেছে। ফলে ফাটল দেখা দিয়েছে পাড়ে। ভেঙে পড়তে পারে যে কোনো সময়।

'তুমি তো জিজ্ঞেস করোনি,' মৃদুস্বরে বললো কপালকুণ্ডলা।

'আমার কি মাথার ঠিক আছে!' ক্ষিপ্তের মতো বললো নবকুমার। 'কি জিজ্ঞেস করবো বলো—মৃণ্ময়ী! বলো—বলো— বলো—আমাকে বাঁচাও।—ঘরে চলো।'

'যা জিজ্ঞেস করলে, বলবো। আজ যাকে দেখেছো, সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নই। যা বললাম, সত্যি। কিন্তু আমি আর ঘরে যাবো না। ভবানীর

চরণে দেহ বিসর্জন দিতে এসেছি—নিশ্চয়ই তা করবো। তুমি ঘরে যাও। আমি মরবো। আমার জন্যে খামোকা কষ্ট পেও না।'

'না, মৃণ্ময়ী! না—,' বলতে বলতে কপালকুণ্ডলাকে ধরার জন্যে দুহাত বাড়ালো নবকুমার। কপালকুণ্ডলাকে আর পেলো না।

চৈত্রবাতাসের আঘাতে বিরাট এক ঢেউ বয়ে গেল, পাড়ের যেখানে কপালকুণ্ডলা দাঁড়িয়ে আছে তার গোড়া দিয়ে। অমনি কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে ভেঙে পড়লো ফাটলের ওপাশের মাটির চাঙড়টা। পাড় ভাঙার শব্দ শুনলো নবকুমার, হারিয়ে যেতে দেখলো কপালকুণ্ডলাকে। আর্তনাদ করে উঠলো নবকুমার। সঙ্গে সঙ্গে জলে লাফিয়ে পড়লো সে-ও। সাঁতার কেটে, ডুব দিয়ে খুঁজতে লাগলো কপালকুণ্ডলাকে।

অনেকক্ষণ খুঁজলো নবকুমার, কিন্তু পেলো না কপালকুণ্ডলাকে, নিজেও আর উঠলো না।

সেই অনন্ত নদী প্রবাহে, বসন্ত বাতাসে বিক্ষিপ্ত ঢেউয়ের দোলা দুলতে দুলতে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা কোথায় গেল?

***

কিশোর ক্লাসিক

বাংলা উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

কপালকুণ্ডলা

কিশোরোপযোগী করে পরিবেশন করেছেন

নিয়াজ মোরশেদ

নবকুমারের কানে কানে বলে গেল অপরূপা—'পালাও! নরমাংস না হলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, জানো না?'
নবকুমারের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কাপালিক।
'হাত ছাড়ুন,' বলল নবকুমার।
উত্তর দিল না কাপালিক। নবকুমার আবার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?'
'পূজার জায়গায়,' কাপালিকের জবাব।
'কেন?'
'বলি দেব তোমাকে।'
প্রচণ্ড শক্তিতে ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল নবকুমার। লাভ হলো না। বিন্দুমাত্র শিথিল হলো না কাপালিকের বজ্রমুষ্টি।
তারপর?